দ্বাদশ-ইমামী শী‘আ ধর্মের মূলনীতিসমূহের সুস্পষ্ট রূপরেখা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব

অনুবাদ : মো: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011-1432

IslamHouse.com

﴿ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية ﴾

« باللغة البنغالية »

محب الدين الخطيب

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: الدكتور أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين وآله و صحبه أجمعين.

(সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্য; আর সালাত (দরূদ) ও সালাম শ্রেষ্ঠ রাসূল (মুহাম্মদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সব সাহাবীগণের প্রতি) । **অতঃপর:**

সাম্প্রতিক বছরসমূহে দ্বাদশ ইমামী শী‘আ সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তাদের বিরোধী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত, যায়েদীয়া ও ইবাদীয়া মতাদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। তাই এ বিষয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে।

সম্মানিত বিজ্ঞ ইসলামী লেখক সাইয়্যেদ মুহিব্বুদ্দীন আল-খতিব শী‘আ সম্প্রদায়ের মূলগ্রন্থসমূহ থেকে এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন

করেছেন; যাতে তা থেকে ঐক্যের সুত্রগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়া যায়। অবশেষে তার নিকট তা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, শী‘আ মতাবলম্বী নীতিমালা প্রস্তুতকারীগণ তাদের নীতিমালায় এ ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন একটি উপায়ও অবশিষ্ট রাখেন নি। কেননা, তারা তাদের এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন কতগুলো নীতিমালা বা স্তম্বের উপর, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার সম্পূর্ণ বিপরীত; যেদিকে তাঁর সাহাবীদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁর পরবর্তীদের জন্য তাঁদেরকে সুস্পষ্ট আলোকোজ্জ্বল দলীল-প্রমাণস্বরূপ রেখে গেছেন, যা কোন পরিবর্তনকারী পরিবর্তন করলে তার ধ্বংস অনিবার্য!

আর এ গবেষণার মধ্যে বর্ণিত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বাদশ ইমামের অনুসারী শী‘আ দল কর্তৃক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে; পৃষ্ঠাসমূহের নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গ্রন্থসমূহের প্রকাশকাল ও সংস্করণ সংখ্যার বিবরণ দেয়া হয়েছে, সুতরাং এ ব্যাপারে কেউ সন্দেহ বা অযথা বিতর্ক করতে পারবে না। এ জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এগুলো আমরা জনসমক্ষে পেশ করব, যাতে করে যে বেঁচে থাকবে, সে যেন দলীল-প্রমাণসহ

বেঁচে থাকে; আর যে ধ্বংস হওয়ার, সে যেন দলীল-প্রমাণসহ ধ্বংস হয়ে যায়। আর আল্লাহ সুপথপ্রাপ্তদের বন্ধু ও অভিভাবক।

জেদ্দা: ১৪ রজব ১৩৮০ হি. **মুহাম্মদ নাসিফ**

[দ্বাদশ-ইমামী শী‘আ ধর্মের মূলনীতিসমূহের সুস্পষ্ট চিত্র এবং তাদের ও ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিরকার নীতিমালার মধ্যে সমন্বয় সাধনের অসাধ্যতা]

বিভিন্ন মাযহাব ও ইসলামী উপদলসমূহের মধ্যে ঐক্যের বিষয়

চিন্তা-চেতনা, মনন, গতিবিধি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য সাধন করা ইসলামের অন্যতম মহৎ উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং শক্তি-সামর্থ, জাগরণ ও সংশোধন বা সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আর তা হবে সর্বযুগে ও সকল স্থানে তাদের জনগোষ্ঠী ও জোটগুলোর জন্য কল্যাণজনক।

এ ঐক্য সাধনের দিকে আহ্বান করা যখন সৎ উদ্দেশ্যে হয় এবং তার ব্যাপক আয়োজনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উপকারের আড়ালে ক্ষতির উদ্দেশ্য না থাকে, তখন সকল মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

হবে সে আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং তা সফল করার উদ্দেশ্যে মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে পরস্পর সহযোগিতা করা।

বিগত বছরগুলোতে এ ঐক্যের দাওয়াত নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে; অতঃপর তার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কি তা আল-আযহার পর্যন্ত পৌঁছেছে। অথচ আল-আযহার হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ফিকহী মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীদের একটি বিখ্যাত দীনী প্রতিষ্ঠান। অতঃপর আল-আযহারে 'তাকরীব' বা 'ঐক্যের' ধারণাটিকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে। ফলে বিরতিহীনভাবে সালাহ উদ্দিন আল-আইয়ূবী'র আমল থেকে এখন পর্যন্ত চলে আসা আল-আযহার কর্তৃক গ্রহণ করা ধারা ও গণ্ডির বাইরে এ ঐক্যের ধারণাটি গ্রহণ করে। এভাবেই আল-আযহার কর্তৃপক্ষ এই গণ্ডি থেকে বের হয়ে অন্যান্য মতবাদসমূহের ব্যাপারে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। তাই তারা প্রথমেই জানতে চায় দ্বাদশ-ইমামী শী'আদের মাযহাব (مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية) সম্পর্কে। তবে এখন পর্যন্ত আল-আযহার কর্তৃপক্ষ এই কর্মসূচির প্রথমেই রয়ে গেছে। এ জন্যই এ গুরুতর বিষয়টি নিয়ে এমন প্রত্যেক মুসলিমের আলোচনা, গবেষণা ও উপস্থাপনা গুরুত্বের দাবী রাখে, যার এ ব্যাপারে সামান্যতম জ্ঞানও রয়েছে

এবং যে এর সাথে সম্পর্ক রাখার পরিণতি ও এর সমস্যা ও ফলাফল সম্পর্কে অবহিত রয়েছে।

ধর্মীয় মাসআলাগুলোর স্বভাব-প্রকৃতি যখন কণ্টকময়, তখন তার সমাধান হওয়া উচিত অত্যন্ত হিকমত, দূরদৃষ্টি ও নৈপুন্যতার সাথে; আর এ বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগগ্রহণকারীকে হতে হবে গভীর যুক্তিনির্ভর; আল্লাহর নূরের আশ্রয়ী এবং চিন্তা-ভাবনা ও রায় প্রদানে ইনসাফনির্ভর, যাতে এই সমাধানটি উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ফলপ্রসু ও উপকারী হয়।

আর এই বিষয়ে এবং অনুরূপ এমন প্রত্যেকটি ঘটনা বা বিষয় যার মূলে একাধিক পক্ষের সম্পৃক্ততা রয়েছে, এসব বিষয়ে আমাদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণী হল যে, এটা ফলপ্রসু হওয়ার শক্তিশালী উপায় হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষ বা পক্ষসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা।

এ জন্য আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আদের তাকরীবের (সমন্বয় সাধন ও ঐক্যের) বিষয়টিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করি। কারণ, লক্ষ্য করা যায় যে, উভয় পক্ষকে কাছাকাছি নিয়ে আসা বা উভয়ের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দাওয়াতের

জন্য মিসরে একটি কমপ্লেক্স তৈরি হয়, যার জন্য এক শী‘আ রাষ্ট্রের সরকারী বাজেট থেকে অর্থ ব্যয় করা হয়। আর এই মহনুভব শী‘আ রাষ্ট্রটি তাদের এই মহানুভবতা ও সম্মান দ্বারা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছে এবং তারা এই সরকারী অনুদান দ্বারা আমাদেরকেই বিশেষিত করেছে। অথচ তারা তাদের নিজেদের এবং মাযহাবের অনুসারীদের ব্যাপারে অনুরূপ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কি তারা শী‘আ মাযহাব সম্প্রসারণ ও প্রচার কেন্দ্রগুলো মধ্য থেকে তেহরান, কুম, নাজাফ, জাবালে আমেল প্রভৃতি স্থানে এই ‘দারে তাকরীব’ (دار تقريب) তৈরিতেও অনুরূপভাবে ব্যয় করার মত উদারতা প্রকাশ করে নি।[1]

[1] আর এই প্রাধান্য প্রদান তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন যুগে বারবার করা হয়েছে; আর এই ধরনের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা যাদেরকে দা‘ঈ হিসেবে প্রেরণ করেছে, তাদের দ্বারা তারা দক্ষিণ ইরাকের শী‘আ সংখ্যালঘু সুন্নি অঞ্চলকে সুন্নি সংখ্যালঘু শী‘আ অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছে। আল-জালাল আস-সাইয়ুতীর আমলে ইরান থেকে তাদের দাওয়াতী মিশনের পক্ষ থেকে এক দা‘ঈ (আহ্বানকারী) মিসরে গিয়ে উপস্থিত হয়। আস-সাইয়ুতী তাঁর ‘আল-হাবী লিল ফাতাওয়ী’ (الحاوي للفتاوي) নামক কিতাবের মনিরীয়া সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৩৩০ পৃষ্ঠায় এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন; আর এই ইরানী দা‘ঈ’র কারণেই আল-সাইয়ুতী তাঁর “মিফতাহ

শী‘আ মতবাদ প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রগুলো থেকে বিগত বছরগুলোতে এমন কতগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলো পারস্পরিক সমন্বয় ও আপোষ-মীমাংসার সকল চিন্তা-ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়; যার কারণে শরীর শিহরিত হয়। সেসব গ্রন্থসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম একটি গ্রন্থের নাম হল ‘আয-যাহরা’ (الزهراء), যা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এ গ্রন্থটি নাজাফের শী‘আপন্থি আলেমরা প্রকাশ করেছে। তাতে তারা আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র ব্যাপারে (অত্যন্ত আপত্তিকর কথা) বলেছে: তিনি এমন এক জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন, পুরুষ লোকের বীর্য ব্যতীত তার চিকিৎসা হতো না (না‘উযুবিল্লাহ)!!? এ বিষয়টি আলজেরিয়ার আলেমকুল শিরোমণি অধ্যাপক আল-বশির আল-ইবরাহিমী প্রথমবার ইরাক সফরে গেলেই তার দৃষ্টিগোচর হয়।

সুতরাং যে সব অপবিত্র আত্মা থেকে এ ধরনের মাযহাবী অপকর্ম প্রকাশ পায়; আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের চেয়ে

আল-জান্নাত ফিল ই‘তিসাম বিস-সুন্নাহ” (مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة) নামক পুস্তিকাটিও রচনা করেছিলেন।

‘ঐক্য সাধনের’ দিকে তাদেরকে আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তাই বেশি।

যখন আমাদের ও তাদের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য বিদ্যমান তাদের এই দাবির উপর ভিত্তি করে যে, তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি আহলে বাইতের (নবী পরিবারের) বন্ধু ও মিত্র; আর যখন যাদের কাঁধের উপর ভর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব সাহাবীদের উদ্দেশ্যে তারা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা গোপন করে (বস্তুত প্রকাশই করে থাকে), এমনকি আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র এর ব্যাপারে তারা এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার অবস্থায় পৌঁছেছে; তখন ইনসাফের দাবি অনুযায়ী তারাই ইসলামের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসানকল্পে কার্যক্রম সূচনা করবে এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মহতি অবস্থান ও তাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রকার কমতি না করার কারণে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। তবে আহলে বাইতের প্রতি আমাদের কমতি হচ্ছে আমরা তাঁদেরকে ইলাহ

হিসেবে গ্রহণ করি নি যে, আমরা আল্লাহর সাথে তাঁদের ইবাদত করব; যেমন দৃশ্য তাদের কবরস্থানগুলোতে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। যে অংশে আমাদের ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইচ্ছা করা হয়ে থাকে।

নিশ্চয় উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি; আর বাদী ও বিবাদী একত্রিত হওয়া ব্যতীত এ ধরনের আলাপ-আলোচনা হতে পারে না। আর এ ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়নের ব্যাপারে আহ্বান জানানোর ক্ষেত্রে কোন এক পক্ষ থেকে শৈথিল্য প্রদর্শন করলেও হবে না, এখন যেমন হচ্ছে।

ঐক্য প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে শী‘আ মতবাদের প্রধান নগরীসমূহ, শী‘আ মতবাদের বিজ্ঞাপন প্রদান ও অন্যান্য মতের উপর বাড়াবাড়ি করতে তৎপর প্রচার ও প্রকাশনা কেন্দ্রসমূহের কথা না বলে কেবল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের প্রধান নগরী মিসরে ‘ঐক্য সংস্থা’ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতার ব্যাপারে পূর্বে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে উভয়পক্ষের ঐক্যের বিষয়টি শী‘আ প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করার পূর্বে আল-আযহারের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা কতটুকু যৌক্তিক—সেটা বলাই বাহুল্য।

তবে এখনকার বাস্তবতার মত যখন বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষ বা পক্ষসমূহের মধ্য থেকে কোন এক পক্ষের উপর সীমাবদ্ধ করা হয়, তখন তার সফলতা আশা করা যায় না।

পারস্পরিক পরিচিতির সবচেয়ে বাজে মাধ্যম হচ্ছে মৌলিক বিষয়ের পূর্বে শাখা-প্রশাখাজনিত বিষয় দিয়ে শুরু করা! **যেমন ফিকহ শাস্ত্র।** আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আ উভয়ের নিকটই ফিকহ এমন বিষয় যা উভয়ের-নিকট-স্বীকৃত কোন নীতিমালার দিকে ধাবিত করা যায় না। শী'আদের নিকট ফিকহী শরীয়ত যে বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম চতুষ্টয়ের নিকট ফিকহী শরীয়ত সে বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যতক্ষণ-না শাখা-প্রশাখায় মনোযোগ দেয়ার পূর্বে এই মূলনীতিসমূহ ও বুনিয়াদের উপর আপোষ-মীমাংসা হবে এবং যতক্ষণ না এই ব্যাপারে উভয়ের পক্ষ থেকে ফলপ্রসু আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় সম্পন্ন হবে, ততক্ষণ মূলনীতিসমূহের পূর্বে শাখা-প্রশাখায় অযথা সময় নষ্ট করে কোন ফায়দা হবে না। আর এই নীতিমালা বলতে আমারা 'উসুল আল-ফিকহ' তথা ফিকহ শাস্ত্রের নীতিমালাকে বুঝাচ্ছি না,

বরং উভয়পক্ষের ‘উসুল আল-দীন’ তথা দীনের নীতিমালার একেবারে প্রথম শিকড়সমূহকে বুঝাচ্ছি।

তাকিয়্যা (التقية)-এর মাসআলা

আমাদের ও তাদের মাঝে একনিষ্ঠতার সাথে যথাযথ আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল তাদের তথাকথিত “তাকিয়্যা” (التقية)।[2] কারণ,

---

[2] ‘তাকিয়্যা’ হচ্ছে মানুষের মনের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করা (অর্থাৎ ভিতর এক রকম, আর বাহির অন্য রকম)। আর এই ব্যাপারে তারা অনেকগুলো হাদিসকে দলীল হিসেবে পেশ করে। তন্মধ্যে একটি হাদিস তারা আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র থেকে নকল করেন। তাতে তিনি তাদের ধারণামতে বলেন: “তাকিয়া হচ্ছে মুমিনের সর্বোত্তম আমল, তার দ্বারা সে নিজেকে ও তার ভাইদেরকে অপরাধীদের হাত থেকে রক্ষা করে।”—দ্র. তাফসীর আল-‘আসকারী (تفسير العسكري), পৃ.১৬২, জাফরী প্রকাশনা, ভারত।

অপর একটি হাদিস তাদের ধারণামতে পঞ্চম ইমাম মুহাম্মদ আল-বাকের বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেন: “তাকিয়া আমার এবং আমার বাপ-দাদার ধর্ম, সুতরাং যার তাকিয়া নেই, তার ঈমান নেই।”—দ্র. আল-উসুল মিন আল-কাফী (الأصول من الكافي), তাকিয়া অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ.২১৯

তা এক ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস যা তাদের জন্য তাদের মনে যা আছে, তার বিপরীত কিছু আমাদের জন্য প্রকাশ করার বৈধতা দেয়। ফলে আপোষ-মীমাংসা ও ঐক্যের ব্যাপারে আমাদের মধ্যকার সরল মনের ব্যক্তির জন্য তারা আগ্রহভরে যা প্রকাশ করে, তাতে সে রীতিমত প্রতারিত হয়। আর তারা এধরনের সমঝোতা চায় না; তাতে তারা সন্তুষ্ট নয় এবং সে জন্য তারা কোন কাজও করে না। তবে তারা চায় এ ধরনের উদ্যোগ এক পক্ষের[3] মাঝেই বিদ্যমান থাকুক, অপর পক্ষ[4] তার অবস্থান থেকে এক চুল পরিমাণও না সরে একাকিত্বের মধ্যেই অটল থাকুক।

আর তাদের মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হোসাইন ইবন বাবুইয়া আল-কুমী তার 'আল-ই'তিকাদাত' (الاعتقادات) নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করেন: "তাকিয়া ওয়াজিব; যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিল, সে ঐ ব্যক্তির মত, যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল।" এবং তিনি আরও বলেন: "তাকিয়া ওয়াজিব; দাঁড়ানো ব্যক্তির জন্য তা রেখে দিয়ে বের হওয়া বৈধ নয়; সুতরাং যে ব্যক্তি বের হওয়ার পূর্বে তাকিয়া ছেড়ে দিল, সে যেন আল্লাহ তা'আলা ও ইমামিয়ার দীন থেকে খারিজ হয়ে গেল এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইমামগণের বিরুদ্ধাচরণ করল।"—দ্র. 'আল-ই'তিকাদাত' (الاعتقادات), তাকিয়া পরিচ্ছেদ, প্রকাশকাল: ইরান ১৩৭৪হি.

[3] আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।

[4] অপর পক্ষ মানে-শী'আ পক্ষ।

যদি তাদের মধ্য থেকে কোন কোন অভিনেতা আমাদেরকে পরিতুষ্টকরণের জন্য তাকিয়্যার ভূমিকায় অভিনয়ে উপনিত হয় এইভাবে যে, তারা আমাদেরকে উপলক্ষ্য করে কিছু পরিকল্পনা করল, তবে শী'আদের বিশেষ ও সাধারণ শ্রেণী বলে কথা নেই, বরং তাদের সবাই—প্রত্যেকেই ঐ অভিনতার কাজ-কর্ম থেকে পৃথক থাকবে এবং যারা তাদের নামে কথা বলছে, তাদের নামে কথা বলার অধিকার তারা দিবে না।

আল-কুরআনুল করীমের উপর অপবাদ

এমন কি তারা আল-কুরআনুল করীমের উপর অপবাদ দেয়, যা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ও তাদের মূল প্রত্যাবর্তনস্থল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, তাদের ধর্মীয় নীতিমালার শিকড়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার ও বিকৃত অর্থের উপর; যার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তাঁর সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম অনুধাবন করেছেন এবং যে প্রজন্মের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, তাঁদের নিকট থেকে ইসলাম ধর্মের প্রসিদ্ধ ইমামগণ উপলব্ধি করেছেন।

বরং নাজাফের বিজ্ঞ আলেমদের অন্যতম, আলহাজ মির্জা হোসাইন ইবন মুহাম্মদ তকী আন-নুরী আত-তাবারসী; যাকে ১৩২০ হিজরিতে মৃত্যুর সময় তারা (শী‘আগণ) বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে এবং তারা তাকে নাজাফের আল-মুরতাজা মাশ্‌হাদের সুলতান নাসের লিদ্বীনিল্লাহ এর কন্যা মহামতি বানু এর কক্ষে অভ্যন্তরে দাফন করেছে; আর তা পবিত্র নাজাফের বাবুল কিবলার আল-মুরতাজা চত্বরের অভ্যন্তরভাগের ডান পার্শ্বের কিবলামুখী কক্ষের দফতরখানার পাশে; যা তাদের নিকট সর্বাধিক পবিত্র ভূমি বলে পরিচিত।

এই নাজাফী আলেম ১২৯২ হিজরিতে নাজাফে আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কথিত কবরের নিকটে বসে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম দিয়েছেন ‘ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’ (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) [শিরোনামের অর্থ: ‘প্রভুদের প্রভুর কিতাবের বিকৃতি প্রমাণে সুস্পষ্ট ভাষ্য’]। তিনি তাতে বিভিন্ন যুগের শী‘আ আলেম ও গবেষকদের নিকট থেকে শত-শত নস ও বর্ণনা একত্রিত করেছেন, যার মূলকথা হল, আল-কুরআনুল করীমের মধ্যে কম-বেশি করা হয়েছে।

তাবারসী’র এই কিতাবটি ১২৮৯ হিজরিতে ইরানে প্রকাশ করা হয়। আর তা মুদ্রণের সময় তার চতুর্দিকে তুমুল হৈচৈ ও গণ্ডগোল শুরু হয়। কারণ, তারা চাচ্ছিল যে, আল-কুরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের বিষয়টি তাদের বিশেষ ব্যক্তিদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকুক এবং তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য শত শত কিতাবের মধ্যে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে তা বিদ্যমান থাকুক। তারা মোটেও চায় নি যে, এই সবগুলো বিষয়ই একই গ্রন্থে একত্রিত করে হাজার হাজার কপি প্রকাশ হোক এবং তাদের বিরোধীরা তা দেখুক; যার ফলে তা সকলের দৃষ্টিসম্মুখে তাদের বিরুদ্ধে একটা উজ্জ্বল প্রমাণ হয়ে থাকবে।

যখন এ ব্যাপারে তাদের পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তখন লেখক তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন; যার নাম দিয়েছেন ‘রাদ্দু বা‘আদিশ শুবহাত ‘আন ফাসলিল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’ (رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأرباب); [যার অর্থ হচ্ছে, ‘প্রভুদের প্রভুর কিতাব বিকৃতি প্রমাণে সুস্পষ্ট ভাষ্য’ গ্রন্থ সংক্রান্ত কিছু সন্দেহের অপনোদন’] তিনি তার এই প্রতিরোধমূলক গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন

তার শেষ জীবনে, মৃত্যুর আনুমানিক দুই বছর পূর্বে। ‘আল-কুরআন বিকৃত’—এই কথা প্রমাণের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান স্বরূপ তারা তাকে নাজাফের শ্রেষ্ঠ মর্যাদাপূর্ণ (তাদের ধারণা মতে) সমাধিস্থলে দাফন করে।

এই নাজাফী আলেম আল-কুরআনের মধ্যে যে কাটছাঁট করা হয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে তার কিতাবের ১৮০ পৃষ্ঠায় একটি সূরার উল্লেখ করেছেন; শী‘আগণ তার নাম রেখেছেন ‘সূরাতুল বেলায়াত’ (سورة الولاية); এর মধ্যে আলী রা. এর বেলায়াত প্রসঙ্গে আলোচনা রয়েছে:

" يا أيها الذين آمنوا: آمِنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم..." إلخ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী এবং ওলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি; তারা তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে...” শেষ পর্যন্ত।[5]

---

[5] এই সূরার পরিপূর্ণ রূপ আপনি সামনের পৃষ্ঠায় দেখতে পাবেন। তার বাকি অংশের বাংলা অনুবাদ হল: “নবী এবং ওলী; তারা একে অপরের অংশ, আর

আমি মহাজ্ঞানী, সকল বিষয়ে অবহিত। নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। আর যাদের নিকট যখন আমাদের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের মধ্যে মহান জায়গা। যখন কিয়ামতের দিন তাদেরকে ডাকা হবে, কোথায় সেই যালিমগণ, রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ। কিসে তাদেরকে রাসূলদের বিরোধিতায় লিপ্ত করেছে??? তবে যদি হয় সেটা যথাযথ সেটা ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি নিকটতম সময়ের মধ্যে তাদেরকে বিজয় দান করবেন। সুতরাং তুমি তোমার রবের গুণকীর্তন কর, আর আলী সাক্ষ্যদাতাদের একজন।"

এটি শী'আদের বানানো সূরা, যার গঠনরীতি বোকামীর পরিচয় দেয়, আর যা খুবই কুটিল এবং দুর্বল বিবেক উৎসারিত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর যা ব্যাকরণগত বীভৎস ভুল-ত্রুটিতে ভরপুর। এ সবই প্রমাণ করে যে, তা নির্বোধ পারস্যবাসী অনারবদের দ্বারা রচিত এক অনারব বানোয়াট 'সূরা'; যারা নিজেদেরকে এই সূরার সাথে সম্পৃক্ত করে নিজেরাই কলঙ্কিত হয়েছে!

এই হলো শী'আদের যা ত্রুটিপূর্ণ, বানোয়াট ও দুর্বল 'কুরআন'! আর আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কুরআন হল সুস্পষ্ট আরবি ভাষার কুরআন, সম্পূর্ণ জটিলতামুক্ত; তার মাঝে রয়েছে মধুরতা ও ধীরস্থিরতা; তার উপর ও নীচ লাভজনক ও প্রচুর গভীরতা সম্পন্ন; তা ঈমানদারদের জন্য পথপ্রদর্শক ও চিকিৎসা স্বরূপ। আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কর্ণে বধিরতা ও তাদের উপরে অন্ধত্ব!!

বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য উস্তাদ মুহাম্মদ আলী সাঊদী, যিনি মিসরের বিচার মন্ত্রণালয়ের বড় মাপের একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং শাইখ মুহাম্মদ ‘আবদুহু’র বিশেষ ছাত্র ছিলেন, তিনি প্রাচ্যবিদ ব্রাইনের নিকট লিখিত একটি ইরানী মুসহাফ দেখতে সমর্থ হন; অতঃপর সেখান থেকে একটি প্রকাশিত সূরা ফটোগ্রাফের মাধ্যমে নকল করেন। তার লাইনের উপরের অংশ আরবি ভাষায়, আর তার নীচে ইরানী ভাষায় অনুবাদ। যা আল-তাবারসী তার ‘ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’ (فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأرباب) নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এই সূরাটি মুহসিন ফানী আল-কাশ্মিরী কর্তৃক ইরানী ভাষায় লিখিত তাদের ‘দাবিস্তানে মাযাহিব’ (دَبِستان مذاهب) নামক কিতাবেও বিদ্যমান রয়েছে; যার অনেক সংস্করণ ইরানের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সেখান থেকে প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত নুওয়ালদিক তার ‘তারীখুল মাসাহেফ’ (تاريخ المصاحف) নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় আল্লাহর নামে মিথ্যারোপিত এই বানোয়াট সূরাটি সংকলন করেছেন এবং তা ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে (الجريدة الآسيوية الفرنسية) নামক এশীয়-ফ্রান্সীয় ম্যাগাজিনের ৪৩১-৪৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।

যেমনিভাবে নাজাফী আলেম ‘সূরাতুল বেলায়াত’ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যে, ‘আল-কুরআন বিকৃত’; অনুরূপভাবে তিনি ১২৭৮ হিজরিতে ইরানে মুদ্রিত ‘আল-কাফী’[6] নামক গ্রন্থের ২৮৯ পৃষ্ঠায় যা বর্ণিত আছে, তা দ্বারাও এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেছেন। আর এই কিতাবটির মর্যাদা তাদের নিকট তেমন পর্যায়ের, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট সহীহ বুখারীর মর্যাদা যেমন। ‘আল-কাফী’ নামক গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নসটি হল:

“আমদের অনেক সঙ্গী সাহল ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথীর নিকট থেকে বর্ণনা করেন। তারা আবুল হাসান আ. থেকে বর্ণনা করেন। অর্থাৎ আবুল হাসান আস-সানী আলী ইবন মূসা আর-রেদা (মৃত্যু: ২০৬ হি.)। তিনি বলেন: “আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য আমি উৎসর্গ, আমরা কুরআনের আয়াত শ্রবণ করি, কিন্তু আমরা যেমন শুনি তা তেমন নয়; আপনাদের নিকট থেকে আমাদের নিকট যেভাবে এসেছে, সেভাবে পাঠ করতে পারি না। সুতরাং তাতে আমরা গুনাহগার

---

[6] তার পুরা নাম “আল-জামে‘ আল-কাফী”—আবু জাফর ইয়াকুব আল-কুলাইনী আল-রাযী।

হব কিনা?” জওয়াবে সে বলল: “না, তোমরা যেমনিভাবে শিখেছ তেমনিভাবে পাঠ কর; অচিরেই সেই ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।”

সন্দেহ নেই যে, এই বক্তব্যটি শী‘আগণ তাদের ইমাম আলী ইবন মূসা আর-রেদার নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে; কিন্তু তাদের নিকট এর মানে হল: এই ফতোয়া দেয়া যে, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এমনভাবে যেমনিভাবে মানুষ তা ‘মুসহাফে ওসমানী’-এর মধ্যে যেমনভাবে শিখে, তাতে ঐ ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। অতঃপর শী‘আদের বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ একে-অপরকে সেগুলোর বিপরীত অংশ শিক্ষা দিবে। আর তা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে, এই ভিন্ন বিষয়গুলো আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত তাদের ইমামদের নিকট মওজুদ আছে বা ছিল।

এখানে শী‘আদের বানানো সূরা ‘সূরাতুল বেলায়াত’-এর উল্লেখ করা হল, যা ইরানের মুসহাফসমূহের কোন একটি থেকে ফটোগ্রাফ করে এই বইয়ে সংকলিত হয়েছেন এবং তাতে প্রত্যেকটি বাক্যের ফারসি অনুবাদও রয়েছে। সূরাটির পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য নিম্নরূপ:

سورة الولاية سبع آيات.

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما

يهديانكم إلى صراط مستقيم ۝ نبي وولي بعضهما من بعض

وأنا العليم الخبير ۝ إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم

والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين ۝

إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيمة أين

الظالمون المكذبون للمرسلين ۝ ما خلفهم المرسلين إلا

بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب ۝ وسبح بحمد ربك

وعلي من الشاهدين ۝

سورة الولاية سبع أيات

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الذين آمنوا: آمِنوا بالنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم . نبي و ولي بعضهما من بعض و أنا العليم الخبير . إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم . والذين إذا تُليت عليهم آياتنا كانوا بأياتنا مكذبين !؟؟ . إن لهم في جهنم مقاما عظيما، إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين . ما خالفهم المرسلين !؟؟ إلا بالحق و ما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب . و سبح بحمد ربك و علي من الشاهدين .

বাংলা অনুবাদ

সূরাতুল বেলায়াহ্ – সাতটি আয়াত

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী এবং ওলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি; তারা দু'জনে তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। নবী এবং ওলী; তারা একে অপরের অংশ, আর আমি মহাজ্ঞানী, সকল বিষয়ে অবহিত। নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত। আর যাদের নিকট যখন আমাদের

আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের মধ্যে মহান জায়গা!। যখন কিয়ামতের দিন তাদেরকে ডাকা হবে, কোথায় সেই যালিমগণ, রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ। কিসে তাদেরকে রাসূলগণের বিরোধিতায় লিপ্ত করেছে??? তবে যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে করে থাকে সেটা ভিন্ন। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদেরকে নিকটতম সময়ের মধ্যে বিজয়ী করবেন। আর তুমি তোমার রবের গুণকীর্তন কর, আর আলী সাক্ষ্যদাতাদের একজন।)

কল্পিত ও বানোয়াট কুরআন; তা তারা একে-অপরের নিকট গোপনে বর্ণনা করে এবং 'তাকিয়্যা'র আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে তারা তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে না। আর শী'আদের বড় মাপের সকল আলেম যদি কুরআন বিকৃতির আকিদায় বিশ্বাসী না হত, তবে যে লেখক একটি গ্রন্থ লিখে, যাতে কুরআন বিকৃতির প্রমাণস্বরূপ দুই হাজার হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে, তারা সেই লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করত না। যেমন তারা বলে: 'আল্লাহ তার ভিতরটাকে পবিত্র করুন', অথবা 'তিনি মুহাদ্দিসগণের ইমাম' ইত্যাদি। সুতরাং তারা যদি এর বিপরীত আকিদায় বিশ্বাসী হতেন,

তবে ‘আল-কুরআন বিকৃত’-এ কথা বলার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করতেন, অথবা তারা তাকে আক্রমন করতেন, অথবা তাকে বিদআতপন্থী বলে আখ্যায়িত করতেন, অথবা তাকে কাফির বলে মন্তব্য করতেন... কেননা, ‘কুরআন বিকৃত’— এ কথার পর আর কি থাকতে পারে!?

তাদের এই কল্পিত কুরআন এবং সর্বজনবিদিত কুরআন ‘মুসহাফে ওসমানী’তে লিখিত কুরআনের মধ্যে তুলনা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই হোসাইন ইবন মুহাম্মদ তকী[7] আল-নুরী আল-তাবারসী তার ‘ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’

---

[7] শী‘আদের নিকট “তকী” নামটি খুব প্রসিদ্ধ। যেমন ‘ফাসলুল খিতাব’ কিতাবের লেখকের পিতা। তার নাম ছিল ‘তকী’ তারা এ নামটি “তাকিয়্যা” থেকে গ্রহণ করে, তাকওয়া থেকে নয়। সুতরাং কোন পিতা যদি তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ‘তকী’ নাম রাখে তারা এর দ্বারা সুলক্ষণ গ্রহণ করে। কারণ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এই থাকে যে, এ ব্যক্তি ‘তাকিয়্যা’ বা আসল তথ্য গোপন করে, মুসলিমদেরকে তার বিশ্বাসের বিপরীত অন্য কথা বলে বিভ্রান্ত করতে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী বিবেচিত হবে।

(فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأرباب) নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।[8]

---

[8] শী‘আদের অন্যতম বিজ্ঞ ব্যক্তি, শী‘আদের প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ *‘আল-যারি‘আত ইলা তাসানীফ আল-শী‘আ’* (الذريعة إلى تصانيف الشيعة)-এর লেখক শায়খ আগা বুযুর্গ তেহেরানী তার *‘তাবাকাত আ‘লাম আল-শী‘আ’* (طبقات أعلام الشيعة) নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ যা *‘নুকাবা আল-বাশার ফি আল-কারন আল-রাবে‘ ‘আশার’* (نقباء البشر في القرن الرابع عشر) নামে প্রসিদ্ধ এবং নাজাফের ‘আল-মাতবা‘আ আল-ইলমিয়া’ থেকে ১৩৭৫ হি./১৯৫৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়; তিনি এই গ্রন্থের ৫৪৪ পৃষ্ঠায় আল-নুরী আল-তাবারসী প্রসঙ্গে বলেন: “তিনি মুতাআখ্‌খিরীন যুগের হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের ইমাম, শী‘আ আলেমদের মহান গুরু এবং এই যুগের ইসলামী ব্যক্তিত্বতের মধ্যে অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব।”

যাই হোক, ‘হাদিস ও রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের ইমাম’ আননুরী আত-তাবারসীই একমাত্র ব্যক্তিত্ব নন, যিনি আল-কুরআন বিকৃতির পক্ষে কথা বলেছেন। এই মতের পক্ষে তার মত আরও অনেক বড় বড় ইমামও রয়েছে; যেমন: কাফী ও রওযা গ্রন্থকার আল-কুলাইনী; তাফসীর গ্রন্থকার আল-কুমী, যার ব্যাপারে নাজ্জাশী তার রিজাল গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন: “তিনি হাদিসের বিষয়ে বিশ্বস্ত, গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও সহীহ মাযহাবের অন্তর্ভুক্ত।”; অনুরূপভাবে শী‘আদের অন্যতম আলেম ‘শাইখ আল-মুফিদ’, যার ব্যাপারে নাজ্জাসী ২৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন: “ফিকহ, রিওয়ায়েত, সিকাহ ও

কখনও কখনও শী‘আরা ‘তাকিয়্যা’র আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে আল-নুরী আল-তাবারসীর গ্রন্থের ব্যাপারে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু, গ্রন্থটিতে তাদের বিশেষজ্ঞ আলেমদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে শত-শত দলীল-প্রমাণাদি সংকলিত আছে; যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তারা ‘আল-কুরআন বিকৃত’-এ

ইলমের ব্যাপারে তার গুণ বর্ণনার চেয়েও তিনি মর্যাদার ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রসিদ্ধ।”, আর তার প্রশংসা করেছেন সাইয়্যেদ মুহসীন আল-আমিন তার ‘আ‘ইয়ান আশ-শী‘আ’ (أعيان الشيعة) নামক গ্রন্থে; হা.১/২৩৭; তিনিও কুরআন বিকৃত হয়েছে বলে দাবী করে থাকেন। তদ্রূপ তাদের আলেম ‘আল-কাশী; আল-আরদাবিলী এবং আল-মাজলিসী প্রমূখরাও কুরআনের বিকৃত হওয়ার দাবী করেছে।

আর শী‘আদের বড় মাপের সকল আলেম যদি কুরআন বিকৃতির আকিদায় বিশ্বাসী না হত, তবে যে লেখক একটি গ্রন্থ লিখেছে, - যাতে কুরআন বিকৃতির প্রমাণস্বরূপ দুই হাজার হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে- সেই লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করত না। যেমন তারা বলে: ‘আল্লাহ তার ভিতরটাকে পবিত্র করুন’, অথবা ‘তিনি মুহাদ্দিসগণের ইমাম’ ইত্যাদি। সুতরাং তারা যদি এর বিপরীত আকিদায় বিশ্বাসী হতেন, তবে ‘আল-কুরআন বিকৃত’-এ কথা বলার পর তারা তা প্রত্যাখ্যান করতেন, অথবা তারা তাকে আক্রমন করতেন, অথবা তাকে বিদআতপন্থী বলে আখ্যায়িত করতেন, অথবা তাকে কাফির বলে মন্তব্য করতেন... কেননা, ‘কুরআন বিকৃত’— এ কথার পর আর কি থাকতে পারে!?

কথায় দৃঢ়-বিশ্বাসী। কিন্তু আল-কুরআনের ব্যাপারে তাদের আকিদাকে কেন্দ্র করে হৈচৈ ও গণ্ডগোল শুরু হউক, তারা তা পছন্দ করে না।

এর ফলে প্রতীয়মান যে, (তাদের মাঝে) দু'টি কুরআন বিদ্যমান রয়েছে: একটি হচ্ছে সাধারণ, সর্বজন-পরিচিত এবং অপরটি হল বিশেষ, গোপনীয়। আর তারই অংশবিশেষ হল 'সূরাতুল বেলায়াত' (سورة الولاية)। আর এ ব্যাপারে তারা আমল করে তাদের ইমাম আলী ইবন মূসা আর-রেদার উপর আরোপিত বানোয়াট কথার দ্বারা। আর তা হল:

"اقرءوا كما تعلمتم، فسيجيئكم من يعلمكم"!

"তোমরা যেমনিভাবে শিখেছ তেমনিভাবে পাঠ কর; অচিরেই সেই ব্যক্তির আগমন ঘটবে, যিনি তোমাদেরকে শেখাবেন"!

আর শী'আদের আরও একটি অন্যতম ধারণা হলো, আল-কুরআনের একটি আয়াতকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা হল: " و جعلنا عليا صهرك " (আর আমরা আলীকে তোমার জামাতা বানিয়েছি); তাদের ধারণা এই আয়াতটি সূরা 'আলাম নাশরাহ'

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। তারা জানে, ‘আলাম নাশরাহ’ ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ সূরাটি মাক্কী সূরা— তা সত্ত্বেও এ অযৌক্তিক ধারণার কারণে তারা লজ্জিতও হয় না! অথচ মক্কাতে তাঁর একমাত্র জামাতা ছিল আল-‘আস ইবন আর-রবী‘ আল-উমাওয়ী (العاص بن الربيع الأموي)। যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা’র বর্তমানে আবূ জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ অভিযোগ করেন তখন মসজিদে নববীর মিম্বরে বসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-আস ইবন আর-রবী এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। [সুতরাং কোনভাবেই মক্কী সূরাতে আলীকে জামাতা বানানোর ঘোষণা আসতে পারে না, কারণ ফাতেমা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিয়ে মদীনাতে সংঘটিত হয়েছিল।]

আর যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যার জামাতা হন, তবে উসমান ইবন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দুই কন্যার জামাতা বানিয়ে দিয়েছেন এবং যখন দ্বিতীয় কন্যা ইন্তিকাল করে,

তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন: " لو كانت لنا ثالثة لزوجناكها " অর্থাৎ “আমাদের তৃতীয় আরেকটি কন্যা থাকলে তাকে তোমার নিকট বিবাহ দিতাম।” [সুতরাং জামাতা হওয়ার ব্যাপারটি এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে কুরআনে থাকতে হবে। অথচ এটা প্রমাণ করার জন্য তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের ইমাম উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে, তিনি ‘আলীকে তোমার জামাতা বানালাম’ এরকম একটি আয়াত ফেলে দিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ]

আর তাদের আলেম আবূ মানসুর আহমদ ইবন আলী ইবন আবি তালিব আত-তাবারসী; মৃত্যু: ৫৮৮ হি. (যিনি ইবন শাহরআশূব এর অন্যতম আলেম) তার ‘আল-ইহতিজাজ ‘আলা আহলিল-লাজাজ’ (الاحتجاج على أهل اللجاج) নামক গ্রন্থে বলেন যে, আলী রা. কোন এক নাস্তিককে উদ্দেশ্য করে (তিনি তার নাম উল্লেখ করেন নি) বলেন: আর তুমি যে আল্লাহ তা‘আলার বাণী

﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: ٣]

“তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে।”—(সূরা আন-নিসা: ৩) এ বাণীকে অস্বীকার করে আমার উপর তোমার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছ, একথা বলে যে, ‘নারীদেরকে বিবাহ করা ইয়াতীমের প্রতি ন্যায়পরায়ণতার লক্ষণ নয়; আর সকল নারী ইয়াতীমও নয়।’ তার উত্তর আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছিলাম যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সম্বোধন এবং নারীদের বিবাহের মাঝে যা বলা হয়েছে কাহিনী কিংবা সম্বোধনরূপে, মুনাফিকগণ[9] আল-কুরআন থেকে তা বিলুপ্ত

[9] আবূ মানসুর আল-তাবারসী মুনাফিক দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব সাহবীদেরকে বুঝিয়েছে, যারা আল-কুরআন সংকলন করেছেন। আর আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র তাঁর খিলাফতকালে অর্থ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং যদি এই মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্যটি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র ভাষায় ‘আল-ইহতিজাজ ‘আলা আহলে আল-লাজাজ’ (الاحتجاج على أهل اللجاج) নামক গ্রন্থে সত্য সত্যই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট থেকে প্রকাশ পায়, তবে তাঁর পক্ষ থেকে ইসলামের খিয়ানত করা হয়েছে এইভাবে যে, তাঁর নিকট আল-কুরআনের নষ্ট হয়ে যাওয়া এক তৃতীয়াংশ বিদ্যমান থাকার পরেও তিনি তা প্রকাশ করেন নি; তার উপর আমল করেন নি এবং কমপক্ষে তাঁর খিলাফতকালে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময় করার জন্য জনগণকে কোন

করে দিয়েছে; আর তার পরিমাণ হল আল-কুরআনের এক তৃতীয়াংশের বেশি!?” [নাউযু বিল্লাহ]

[আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর মিথ্যারোপ] মূলত এটা হচ্ছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র উপর তাদের মিথ্যারোপের অন্যতম উদাহরণ। কারণ; আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর খিলাফতকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট আল-কুরআনের [তাদের ধারণামতে] বিলুপ্ত এক তৃতীয়াংশ এই স্থান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে এমন কথা প্রকাশ করেন নি। আর তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে তা প্রতিস্থাপন, তার নির্দেশনার দ্বারা হিদায়াত গ্রহণ ও তার

আদেশও প্রদান করেন নি। আর এই কাজটি করতে সেখানে তাঁর কোন প্রতিবন্ধকতাও ছিল না। যদি বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এই অনর্থক কথাটি বলেছেন, তবে তাঁর পক্ষ থেকে স্বজ্ঞানে ও স্বইচ্ছায় আল-কুরআনের এই পরিমাণ অংশ গোপন করাটা স্পষ্ট কুফরী বলে গণ্য হবে (যা একবারেই অসম্ভব)। সুতরাং এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ‘আল-ইহতিজাজ ‘আলা আহলে আল-লাজাজ’ (الاحتجاج على أهل اللجاج) নামক গ্রন্থের লেখক আবূ মানসুর আল-তাবারসী তার এই গ্রন্থের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহবীদেরকে গালি দেয়া ও তাঁদেরকে মুনাফিক বলে সম্বোধন করার পূর্বে স্বয়ং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গালি দিয়েছে এবং তাঁকে খেয়ানত ও কুফরী করার অপরাধে অপরাধী করেছে (না‘উযুবিল্লাহ)।

বিধানসমূহের উপর আমল করার নির্দেশও প্রদান করেন নি। [সুতরাং এভাবে তারা আলী রাদিয়াল্লাহুকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে]

যখন ‘ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’ (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) নামক গ্রন্থটি আশি বছরেরও অধিককাল পূর্বে ইরান, নাজাফ ও অন্যান্য দেশের শী‘আ ও অন্যানদের মধ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়— আর তাতে আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর বাছাইকৃত সৃষ্টির (বান্দাদের) উপর এই ধরনের মিথ্যারোপের শত শত দৃষ্টান্তে ভরা ছিল— তখন ইসলামের শত্রু মিশনারিরা একে সুসংবাদ মনে করে এবং তারা তাদের ভাষায় তা অনুবাদ করে। এই বিষয়টি মুহাম্মদ মাহাদী আল-আসফাহানী আল-কাযিমী তার ‘আহসানুল ওয়দি‘আহ’ (أحسن الوديعة) নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন। আর এই গ্রন্থটি তাদের ‘রওজাত আল-জান্নাত’ (روضات الجنات) নামক কিতাবের পরিশিষ্ট।

তাছাড়াও এ আল-কুরআনকে বিকৃত দাবী করে তাদের ‘বুখারী’ বলে খ্যাত আল-কুলাইনীর ‘আল-কাফী’ গ্রন্থে স্পষ্ট দু’টি বক্তব্য

এসেছে, তন্মধ্যে ১২৭৮ হিজরিতে ইরান থেকে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের ৫৪ পৃষ্ঠায় প্রথম[10] বক্তব্যটি বিদ্যমান; তা হল:

“জাবির আল-জু‘ফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ জাফর আ.-কে বলতে শুনেছি: কোন মিথ্যাবাদী ছাড়া মানুষের মধ্য থেকে কেউ দাবি করে বলতে পারবে না যে, কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে সে তা সম্পূর্ণভাবে সংকলন করতে সক্ষম হয়েছে। কেবলমাত্র আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর পরবর্তী ইমামগণই শুধু কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে, ঠিক সেভাবে তা সংকলন ও সংরক্ষণ (হিফ্য) করেছেন।”

প্রত্যেক শী‘আই ‘আল-কাফী’ নামক এই গ্রন্থটি পাঠ করে, যা তাদের নিকট তেমন মর্যাদাসম্পন্ন, আমাদের নিকট সহীহ বুখারীর মর্যাদা যেমন। আর তারা প্রত্যেকেই এই বক্তব্যটিতে বিশ্বাস করে।

আর আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারীগণ বলি: নিশ্চয় শী‘আগণ আল-বাকের আবূ জাফর রাহেমাহুল্লাহ-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে; তার দলীল হল, সাইয়্যেদুনা আলী রাদিয়াল্লাহু

---

[10] ১৩৮১ হি. এর সংস্করণে এর পৃষ্ঠা নং ২২৮।

‘আনহু তাঁর খিলাফতকালীন সময়ে কুফাতে আল-কুরআনের ঐ মুসহাফ অনুযায়ীই আমল করতেন, যার সংকলন ও বিভিন্ন শহর-নগরে প্রচার আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর ভাই সাইয়্যেদুনা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পন্ন করেছেন; আর যে কুরআনের উপর আমল করা সর্বযুগে, এখন পর্যন্ত; এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সার্বজনীন করেছেন। যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট মুসহাফে ওসমানী ছাড়া আরও কোন মুসহাফ থাকত— আর তিনি ছিলেন খলিফা, শাসক; তার প্রশাসনিক সীমানায় কেউ তার বিরোধিতাকারী নেই— তবে তিনি তার উপর আমল করতেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়কেও তা সার্বজনীন করা ও তার উপর আমল করার নির্দেশ দিতেন। তাছাড়া যদি তাঁর নিকট মুসহাফে ওসমানী ছাড়া আরও কোন মুসহাফ থাকত এবং তিনি তা মুসলিম সম্প্রদায় থেকে গোপন করতেন, তবে তিনি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামী দীনের খিয়ানতকারী বলে সাব্যস্ত হতেন (না‘উযুবিল্লাহ)!!

আর *জাবির আল-জু‘ফী*; যিনি বলেন যে, তিনি এই নোংরা কথাটি ইমাম আবূ জাফর মুহাম্মদ আল-বাকেরের নিকট থেকে শুনেছেন; যদিও এ *জাবের আল-জু‘ফী* লোকটি তাদের নিকট বিশ্বস্ত ব্যক্তি,

তবে মুসলিম ইমামদের নিকট সে একজন মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত। আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী বলেন: আমি ইমাম আবূ হানিফা রাহেমাহুল্লাহ্-কে বলতে শুনেছি: “আমি যাদেরকে দেখেছি, তাদের মধ্যে ‘আতা’র চেয়ে উত্তম এবং জাবির আল-জু‘ফী’র চেয়ে মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখি নি।”—(দ্র. আল-আযহার ম্যাগাজিনে আমাদের প্রবন্ধ, ১৩৭২ হি., পৃ.৩০৭)।

‘আল-কাফী’ নামক গ্রন্থে আবূ জাফর থেকে বর্ণিত এই প্রথম বক্তব্যটির চেয়ে দ্বিতীয় বক্তব্যটি আরও বেশি মিথ্যা ও বানোয়াট, যা তার ছেলে জাফর আস-সাদিকের নামে মিথ্যারোপ করে বর্ণিত হয়েছে। আর এই বক্তব্যটিও ১২৭৮ হিজরিতে ইরান থেকে প্রকাশিত তাদের বুখারী ‘আল-কাফী’ গ্রন্থের ৫৭ পৃষ্ঠায়[11] বিদ্যমান আছে; আর তা হল:

“আবূ বাসির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবূ আবদুল্লাহর নিকট হাযির হলাম... আবূ আবদুল্লাহ আর্থাৎ জাফর আল-সাদিক বলেন: আমাদের নিকট মুসহাফে ফাতিমা আ. রয়েছে ... তিনি বলেন: আমি বললাম, মুসহাফে ফাতিমা কী? তিনি বলেন: এটা

[11] ১৩৮১ হি. সনের সংস্করণে যার পৃষ্ঠা নং ২৩৮।

এমন এক মুসহাফ, যার মধ্যে তোমাদের এই কুরআনের মত তিনটি কুরআন রয়েছে; আল্লাহর কসম! এর মধ্যে তোমাদের কুরআন থেকে এক হরফও নেই।”

এই হল শী‘আদের মিথ্যা ও বানোয়াট বক্তব্যের নমুনা, যা প্রাচীনকাল থেকে আহলে বাইতের ইমামদের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে; আর এগুলো এক হাজারেরও বেশি বছর পূর্বে মুহাম্মদ ইবন ইয়াকুব আল-কুলাইনী আর-রাযী “আল-কাফী” নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এই বক্তব্যগুলো আরও পুরানো। কারণ, কুলাইনী এগুলো তার পূর্ববর্তী শী‘আ মতবাদের কুশলী মিথ্যাবাদী পণ্ডিতদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছে!

আর যেদিন স্পেন আরব ও ইসলামী শক্তির অধীনে ছিল, তখনকার সময়ে আবূ মুহাম্মদ ইবন হায্ম সেখানকার পাদ্রীদের সাথে তাদের কিতাবে উল্লেখিত নস বা বক্তব্যগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্য যুক্তি পেশ করেন যে, তাদের নসসমূহ বিকৃত, বরং সেগুলোর আসল সংস্করণ পর্যন্ত হারিয়ে-যাওয়া; তখন ঐসব পাদ্রীগণও যুক্তি পেশ করে বলেন যে, শী‘আগণ বলে আল-কুরআনও বিকৃত। ইবন হাযেম তাদেরকে জওয়াব দিয়ে বলেন যে, শী‘আদের দাবি আল-কুরআন ও মুসলিম

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না। কারণ, শী‘আগণ মুসলিম সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত নয়।—দ্র. ইবন হায্ম, ‘আল-ফাসলু ফিল-মিলাল ওয়ান-নিহাল’ (الفصل في الملل و النحل), ২য় খণ্ড, পৃ.৭৮ এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃ.১৮২, প্রথম প্রকাশ, কায়রো।

শাসকদের সম্পর্কে শী‘আদের মত

আর ভয়ানক বাস্তবতা, যার দিকে আমাদের ইসলামী সরকারগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তা হচ্ছে, দ্বাদশ-ইমামী শী‘আ মতবাদ, যার আরেক নাম ‘জা‘ফরীয়্যা’; তাদের মূলভিত এই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র শাসনকালের কয়েকবছর ব্যতীত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দিন থেকে এই সময় পর্যন্ত সকল ইসলামী সরকার হল অবৈধ (বে-শরী‘আতী) সরকার। সুতরাং কোন শী‘আ’র জন্য বৈধ হবে না যে, সে খাঁটি মনে এ সমস্ত সরকারদের দিকে ইখলাস ও বন্ধুত্বের হাত বাড়াবে; বরং সে তাদের সাথে গোপন শত্রুতা করবে এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলবে! কারণ, তাদের পূর্ববর্তী যে সরকারগুলো অতিবাহিত হয়ে গেছে, এখনও যেগুলো প্রতিষ্ঠিত আছে এবং

ভবিষ্যতে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল সরকারই জোর করে ক্ষমতা দখলকারী। শী'আ ধর্মে ও তাদের নির্ভেজাল আকিদা অনুসারে শরীয়াহ্ভিত্তিক প্রশাসক হলো একমাত্র বার ইমাম, শাসন পরিচালনায় তারা সক্ষম হউক আর না-ই হউক। তারা ব্যতীত আবূ বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে শুরু করে যারা মুসলিম উম্মাতের দায়িত্বগ্রহণ করেছে তাঁদের পরবর্তীকালে এখনকার সময় পর্যন্ত— তারা যতই ইসলামের খেদমত করুক; যতই ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণ, আল্লাহর কালেমাকে যমীনে বিজয়ী করা এবং ইসলামী বিশ্বের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য কষ্ট সহ্য করুক— কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তারা জবরদখলকারী!

আবূ বকর ও ওমরকে হিংসা করা

আর এই জন্য শী'আগণ আলী রা. ব্যতীত আবূ বকর, ওমর ও ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং ইসলামী হুকুমাতের প্রত্যেক শাসককে অভিশাপ দিয়ে থাকে। তারা ইমাম আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মূসা'র উপর মিথ্যারোপ করেছে যে, তিনি নাকি তার সম্প্রদায়কে আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে 'জিবত' (الجبت) ও 'তাগুত' الطاغوتনামে ডাকার

অনুমোদন দিয়েছেন। বর্ণনা এসেছে জরহে-তা‘দীলের উপর তাদের সবচেয়ে বড় ও পরিপূর্ণ কিতাব, জা‘ফরীয়া সম্প্রদায়ের শাইখ আল্লামা আল-সানী আয়াতুল্লাহ আল-মামেকানী কতৃক রচিত ও নাজাফের মরতুজা প্রকাশনা থেকে ১৩৫২ হিজরিতে প্রকাশিত ‘তানকীহুল-মাকাল ফি আহওয়ালির-রিজাল’ (تنقيح المقال في أحوال الرجال) নামক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায়, যা অভিজ্ঞ, সম্মানিত শাইখ মুহাম্মদ ইদরীস আল-হিল্লী’র নিকট থেকে “মাসায়েলুর-রিজাল ওয়া মাকাতেবাতিহিম” (مسائل الرجال و مكاتباتهم) নামক কিতাব থেকে ‘আস-সারায়ের’ (السرائر) নামক কিতাবের শেষে নকল করা হয়েছে। আর তা মাওলানা আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন মূসা আ.-এর নামে মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন ঈসা’র মাসায়েল সংকলনে নকল করা হয়েছে; তিনি বলেন: ‘আমি তার নিকট ‘নাসিব’ তথা আলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণকারীর ব্যাপারে জানতে চেয়ে লিখলাম; তাদের শত্রু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ‘জিবত’ (الجبت) ও ‘তাগুত’ الطاغوت-কে প্রাধান্য দেয়ার চেয়ে আরও বেশি কিছুর প্রয়োজন আছে কি? (অর্থাৎ আলে বাইতের প্রতি বড় শত্রুতা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদ্বয় ও উযিরদ্বয়

আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে প্রাধান্য দেয়া এবং তাদের নেতৃত্ব বিশ্বাস করা।) অতঃপর জওয়াব আসল: যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করবে, সে-ই 'নাসিব'। অর্থাৎ এমন প্রত্যেক মানুষই আলে বাইতের শত্রু বলে পরিগণিত হবে, সে যখন আবূ বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে প্রাধান্য দেবে এবং তাদের নেতৃত্বকে বিশ্বাস করবে।

'জিবত' (الجبت) ও 'তাগুত' (الطاغوت)-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়, শী'আগণ এই শব্দগুলো তাদের দো'আর মধ্যে ব্যবহার করে; তারা সেই দো'আর নামকরণ করেছে "কুরাইশদের দুই মূর্তির দো'আ" (دعاء صنمي قريش) ! আর তারা দুই মূর্তি এবং 'জিবত' (الجبت) ও 'তাগুত' (الطاغوت) বলতে আবূ বকর সিদ্দিক ও ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বুঝায় (না'উযুবিল্লাহ)। আর এই দো'আটি তাদের 'মাফাতীহ আল-জিনান' (مفاتيح الجنان) নামক কিতাবের ১১৪ পৃষ্ঠায় আছে; আর এই কিতাবটি ইসলামী বিশ্বের 'দালায়েল

আল-খায়রাত’ (دلائل الخيرات)[12] নামক কিতাবের মানের। আর তাদের সে দো‘আর মূলশব্দ হচ্ছে,

اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد، والعن صنمي قريش وجبتهما وطاغوتيهما وابنتيهما.. إلخ

অর্থ, “হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ কর; আর কুরাইশদের দুই মূর্তি, দুই জিবত, দুই তাগুত এবং তাদের দুই কন্যার উপর লানত বর্ষণ কর....শেষ পর্যন্ত” !![13]

আর তারা এখানে ‘দুই কন্যা’ বলতে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বুঝিয়েছেন।

---

[12] এ কিতাবটির উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। নতুবা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নিকট এটি কোন প্রামান্য গ্রন্থ নয়। [সম্পাদক]

[13] এই দোয়াটি “তোহফা আল-‘আওয়াম মাকবুল” (تحفة العوام مقبول) নামক কিতাবে বর্ণিত আছে এবং তার উপর স্বাক্ষর আছে আয়াতুল্লাহ আল-খুমাইনী, আয়াতুল্লাহ শারই‘য়াতমদারী, আয়াতুল্লাহ আবূল কাসেম আল-খুওয়ী ... সাইয়্যেদ মুহসীন আল-হাকিম আত-তাবতাবায়ী ... প্রমুখের। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যপন্থী বলে পরিচিত; যেমন আল-খুওয়ী ও সাইয়্যেদ মুহসীন আল-হাকিম...

ওমরের হত্যাকারীকে সম্মান করা

[খলিফা ফারুক হত্যার দিন মহা উৎসবের দিন]

তাদের ক্রোধের পর্যায় এতদূর পৌঁছেছে যে, তারা ইরানের অগ্নিপূজকদের আগুন নির্বাপক এবং তাদের পূর্বপুরুষগণের ইসলামে দাখিল হওয়ার অন্যতম পথিকৃত সাইয়্যেদুনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারী আবূ লুলু আল-মাজুসীকে (তার উপর আল্লাহর লানত) বাবা সুজা উদ্দীন (بابا شجاع الدين) [যার অর্থ, ধর্মের বীর পিতা] নামে সম্বোধন করে।

আলী ইবন মুযাহির যিনি শী'আদের রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত লোক, তিনি আহমদ ইবন ইসহাক আল-কুম্মী আল-আহওয়াস থেকে বর্ণনা করেন: ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার দিন হল মহা উৎসবের দিন! গর্ব-অহঙ্কারের দিন; মর্যাদার দিন; মহা পবিত্রতার দিন; বরকতের দিন এবং প্রশান্তির দিন!

শাসনের অধিকার

আবূ বকর, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা, সালাহউদ্দীন আল-আইয়ুবী র.সহ যাঁরা ইসলামের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র জয় করেছেন এবং সেগুলোকে আল্লাহর দ্বীনের অধীনে নিয়ে এসেছেন; আর যাঁরা আমাদের এই দিন পর্যন্ত ইসলামের নামে ঐসব দেশ শাসন করে আল্লাহর দরবারে হাযির হয়েছেন, শী'আদের আকিদা অনুযায়ী তাঁরা সকলেই যালিম শাসক এবং জাহান্নামের অধিবাসী। কারণ, তারা অবৈধ এবং তারা শী'আদের কাছ থেকে বন্ধুত্ব, সত্যিকার আনুগত্য ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা পাওয়ার উপযুক্ত নয়; তবে শী'আদের তাকিয়্যা আকিদা তাদেরকে যতটুকুর অনুমতি দেয় কেবল ততটুকু সাহায্য-সহযোগিতা তারা করতে পারবে, অনুরূপভাবে সে সমস্ত শাসকদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে, অথবা তাদের সাথে মুনাফেকী করার ইচ্ছা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। [না'উযুবিল্লাহ]

[শী‘আরা এমন এক মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে, যে মাহদী তাদের দ্বীন ও নেতৃত্ব জবরদখলকারীদেকে শাস্তি প্রদান করবে ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবে]

তাদের মৌলিক আকিদার মধ্যে অন্যতম একটি আকিদা হল, যখনই মাহদী’র আগমন ঘটবে তিনি হবেন তাদের দ্বাদশ ইমাম, যিনি এখনও জীবিত এবং তারা তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা হবে তার বিপ্লবের সহযোগী সৈনিক। আর তারা যখন তাদের কিতাবে তার আলোচনা দেখতে পায়, তখন তারা তার নাম অথবা লকব অথবা উপনামের পাশে লিখে রাখে: দু’টি হরফ “عج ” অর্থাৎ “عجّل الله فَرَجه” (আল্লাহ তার মুক্তি বা আগমনকে তরান্বিত করুন)। যখনই এই মাহদী জেগে উঠবে তার দীর্ঘ ঘুম থেকে যার পরিমাণ হবে এক হাজার একশত বছরেরও বেশি এবং আল্লাহ শীঘ্রই তার ও তার বাপ-দাদাদের জন্য সমকালীন শাসকদের সাথে পূর্ববর্তী সকল মুসলিম শাসককে বিচার-ফয়সালার জন্য জীবিত করবেন; আর সকলের শীর্ষে থাকবে ‘জিবত’ (الجبت) ও ‘তাগুত’ (الطاغوت)আবূ বকর ও

ওমর। অতঃপর তাদের পরবর্তীগণও!!, তখনই তিনি তার নিকট থেকে এবং তার বাপ-দাদাদের এগারো ইমামের নিকট থেকে শাসন ক্ষমতা জবরদখলের অপরাধে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করবেন। **কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসলামে শাসন ক্ষমতার একমাত্র হকদার তারাই; এর মধ্যে অন্য কারও কোন অধিকার নেই।**

আর ঐসব জবরদখলকারী বিচারের পর তিনি তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিবেন, হত্যার নির্দেশ দিবেন এবং প্রতি পাঁচশতজনকে এক সাথে মৃত্যুদণ্ড দিবেন; এমনকি ইসলামের সকল যুগের শাসকদের মধ্য থেকে তিন হাজারের হত্যা সম্পন্ন করবেন। আর এটা হবে কিয়ামতের দিন শেষ পুনরুত্থানের পূর্বে। অতঃপর যে মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যুর পর এবং যার মৃত্যুদণ্ড হবে তার মৃত্যুদণ্ডের পর, হাশরের জন্য মহা পুনরুত্থান সম্পন্ন হবে; অতঃপর জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে পাঠানো হবে। জান্নাত হবে আহলে বাইতের জন্য এবং যারা তাদের ব্যাপারে এই আকিদায় বিশ্বাস করে তাদের জন্য। আর জাহান্নাম হবে এমন প্রত্যেকের জন্য, যারা শী‘আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

[‘রাজ‘আ’ (الرجعة) আকিদা এবং কুরাইশ গোত্রের তিন হাজার ব্যক্তিকে হত্যা]

এই জীবিতকরণ, বিচার-ফয়সালা ও কিসাস বা শাস্তিবিধানকে শী‘আগণ ‘রাজ‘আ’ (الرجعة) নামে অভিহিত করে থাকে। আর এটা তাদের মূল আকিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি যার ব্যাপারে কোন শী‘আ সন্দেহ পোষণ করে না।

আমি লক্ষ্য করেছি, অনেক ভালো মনের মানুষ ধারণা করে থাকে যে, শী‘আগণ পরবর্তী যুগে এই ধরণের আকিদা পরিবর্তন করেছে, বস্তুত এটি একটি বড় ভুল ধারণা ও বাস্তবতার বিপরীত। কারণ, শী‘আগণ সাফাভী শাসকদের সময় থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই আকিদা-বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছে। আর তারা এখন হয় এসবের প্রতি বিশ্বাসী, অথবা তারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এসব নোংরা চিন্তাধারা বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারা গ্রহণ করেছে। বস্তুত সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম ইরাকে আছে; ইরানেও তা পছন্দনীয় দল, যা শী‘আপন্থী যুবকদের দ্বারা ঘটিত হয়েছে, যারা তাদের ধর্মীয় কুসংস্কারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে শী‘আ থেকে সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে তারা শী‘আ

মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার পর সাম্যবাদী হয়ে গেছে! আর তাদের মধ্যে মধ্যমপন্থী কোন দল নেই। তবে কেউ কেউ মাযহাবী, কূটনৈতিক, দলীয়, অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাকিয়্যার মিথ্যা দাবি করে এবং সে যা দাবি করে, তার বিপরীত বিষয়টি লুকিয়ে রাখে।

আর আপনাকে তাদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে 'রাজ'আ' (الرجعة) আকিদা সম্পর্কে জানতে শী'আদের শাইখ আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ ইবন নুমান; যিনি তাদের নিকট 'আশ-শাইখ আল-মুফিদ' (الشيخ المفيد) নামে পরিচিত; তিনি তার "আল-ইরশাদ ফি তারিখে হুজাজিল্লাহ 'আলাল-'ইবাদ" (الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد) নামক কিতাবের ৩৯৮-৪০২ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন, আমি তা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি; এই গ্রন্থটি ইরানে মুদ্রিত এক প্রাচীন প্রকাশনা যাতে কোন তারিখ উল্লেখ নেই; কিন্তু তা মুহাম্মদ আলী মুহাম্মদ হাসান[14] আল-কালবাবেকাতী লিপিতে মুদ্রিত; তাতে এসেছে, ফযল ইবন শাযান

[14] মূল কিতাবে এমনই আছে; সম্ভবত তা হবে: মুহাম্মদ আলী ইবন মুহাম্মদ হাসান।

বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবন আলী আল-কুফী থেকে। তিনি বর্ণনা করেন ওহাব ইবন হাফস থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবূ বসীর থেকে। তিনি বলেন,

ধ্বংসযজ্ঞ ও প্রতিশোধস্পৃহা

আবূ আবদিল্লাহ (অর্থাৎ জাফর সাদিক) বলেন: কায়েম বা ধারক-বাহকের নাম ধরে ডাকা হবে (এখানে 'কায়েম' দ্বারা তাদের ১২তম ইমাম উদ্দেশ্য; যার ব্যাপারে তারা ধারণা পোষণ করে যে, তিনি এগারো শতাব্দীরও বেশি সময় পূর্ব থেকে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং এর পরও তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি; কারণ, তিনি অচিরেই জেগে উঠবেন এবং বিচার-ফয়সালা করবেন); তেইশ রজনীতে তার নাম ধরে ডাকা হবে এবং তিনি আশুরার দিন দাঁড়াবেন; মনে হচ্ছে যেন আমি তার সাথে মহররমের দশম দিনে রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়ানো, আর জিবরাইল তার ডান পাশে ডেকে বলছেন: "আল্লাহর জন্য বায়'আত কর", তখন শী'আদের জন্য যমীন সংকুচিত হয়ে যাবে, তারা চতুর্দিক থেকে তার নিকট দৌড়ে আসবে এবং তার নিকট বায়'আত গ্রহণ করবে। কেননা বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি মক্কা

থেকে ভ্রমণ শুরু করে শেষ পর্যন্ত কুফায় এসে হাযির হবেন; অতঃপর নাজাফে অবতরণ করবেন এবং সেখান থেকে সৈন্যদেরকে বিভিন্ন দলে বিভিক্ত করে বিভিন্ন শহর-নগরে পাঠাবেন।

আর হাজ্জাল বর্ণনা করেন সা‘আলাবা থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবূ বকর আল-হাদরামী থেকে। তিনি বর্ণনা করেন আবূ জাফর আ. (অর্থাৎ মুহাম্মদ আল-বাকের) থেকে। তিনি বলেন: আমি যেন দ্বাদশ ইমাম আ.-কে নিয়ে কুফার নাজাফে দণ্ডায়মান; আর নাজাফে মক্কা থেকে পাঁচ হাজার ফেরেশতা আগমন করেছে; তার ডান পাশে জিবরাইল; বাম পাশে মিকাইল; আর তার সামনে মুমিনগণ এবং তিনি সৈন্যদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন দেশে পাঠাচ্ছেন।

আর আবদুল করীম আল-জু‘ফী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আবূ আবদিল্লাহ (অর্থাৎ জাফর সাদিক)-কে বললাম, দ্বাদশ ইমাম আ. কত সময় রাজত্ব পরিচালনায় সক্ষম হবেন? তিনি বললেন: সাত বছর; দিনগুলো এত লম্বা হবে যে, এক একটি বছরের পরিমাণ হবে তোমাদের দশ বছরের সমান। সুতরাং রাজত্বের মেয়াদকাল হবে তোমাদের বছরের হিসাবে সত্তুর বছর। আবূ

বসীর তাকে বললেন: আমি আপনার জন্য উৎসর্গ; বলুনতো কিভাবে বছরগুলোকে দীর্ঘায়িত করবেন? তিনি বললেন: আল্লাহ আকাশ বা কক্ষপথকে স্বীয় অবস্থানে অবস্থান করতে এবং কম নড়াচড়া করতে আদেশ করবেন। এর ফলে দিন ও বছরসমূহ দীর্ঘায়িত হবে। আর যখন তার আগমনের সময় হবে, তখন জমাদিউল আখের ও রজব মাসের দশ দিন এত বেশি বৃষ্টি হবে, যা মানুষ কোন দিন প্রত্যক্ষ করে নি। অতঃপর আল্লাহ মুমিনদের দেহে মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে তাদের কবরের মধ্যে তাদের শরীর পূনর্গঠন করবেন; সুতরাং আমি যেন তাদের আগমন লক্ষ্য করছি এবং এও লক্ষ্য করছি যে, তারা তাদের পশমগুলো থেকে বালি ঝেড়ে ফেলছে।

আর আবদুল্লাহ ইবন মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি আবূ আবদিল্লাহ (জাফর সাদিক) আ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন আলে মুহাম্মদের প্রতিনিধি (দ্বাদশ ইমাম)-র আগমন ঘটবে, তখন তিনি কুরাইশদের পাঁচশ জনকে দাঁড় করাবেন; অতঃপর তাদেরকে গর্দান কেটে হত্যা করবেন। অতঃপর আরও পাঁচশ জনকে দাঁড় করাবেন এবং তাদেরকেও গর্দান কেটে হত্যা করবেন। অতঃপর আরও পাঁচশ জনকে হত্যা করবেন; এমনকি

এই কাজটি তিনি ছয়বার করবেন। আমি বললাম: তাদের সংখ্যা এই পরিমাণে পৌঁছাবে?! (এটা বড়ই অদ্ভুত মনে হয়েছিল, কারণ, খোলাফায়ে রাশেদীন, বনী উমাইয়া, বনী আব্বাস এবং জাফর সাদিক পর্যন্ত সকল মুসলিম শাসক মিলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখিত এই সংখ্যার দশ ভাগের একভাগ পরিমাণও হবে না।) জাফর সাদিক বললেন: হ্যাঁ, তারা এবং তাদের দাসরা মিলে এমন সংখ্যা হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে: আমাদের রাষ্ট্রটি হবে অপরাপর রাষ্ট্রের চেয়ে স্বতন্ত্র। আমাদের পূর্বে প্রত্যেক বিখ্যাত বংশেরই রাষ্ট্র হবে, যাতে তারা যখন আমাদের শাসনকার্য দেখতে পাবে, তখন বলতে না পারে যে, আমরা যখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হব, তখন আমরাও তাদের মত শাসনকার্য পরিচালনা করব।

[মাহদী'র আগমনের সাথে সাথে মূল মুসহাফ নাযিলকৃত অবস্থায় ফিরে আসবে]

জাবের আল-জু'ফী আবূ আবদিল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: যখন আলে মুহাম্মদের প্রতিনিধি (দ্বাদশ ইমাম)-র আগমন ঘটবে, তখন তিনি এমন বহু তাঁবু স্থাপন করবেন; সেখানে আল-

কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে শিখানো হবে।[15] ফলে তা পূর্বেকার হাফেযদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির জন্য কঠিন হয়ে যাবে, যে মুসহাফে ওসমানী থেকে হিফয (মুখস্থ) করেছে, যেমনটি জা'ফর সাদিকের যামানায় বিদ্যমান আছে)। কারণ, সংকলনের ক্ষেত্রে তার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে।

আর আবদুল্লাহ ইবন 'আজলান বর্ণনা করেন আবূ আবদিল্লাহ (আ.) থেকে। তিনি বলেন: যখন আলে মুহাম্মদের প্রতিনিধি (দ্বাদশ ইমাম)-র আগমন ঘটবে, তখন তিনি মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করবেন দাঊদ নবীর বিধান দ্বারা?!

আর মুফাদ্দাল ইবন ওমর বর্ণনা করেন আবূ আবদিল্লাহ (আ.) থেকে। তিনি বলেন: কুফা থেকে দ্বাদশ ইমামের সাথে মূসার সম্প্রদায় (!?!?) থেকে সাতাশ ব্যক্তি, আহলে কাহাফ থেকে সাত ব্যক্তি, ইউশা' ইবন নূন, সুলাইমান, আবূ দুজানা আল-আনসারী,

---

[15] কেন তার দাদা আলী ইবন আবি তালিব রা. তাঁর খিলাফতকালীন সময়ে এই কাজটি করেন নি? তাঁর দ্বাদশ নাতি কি কুরআন ও ইসলামের জন্য তাঁর চেয়ে বেশি কামিল?!

মিকদাদ এবং মালিক আল-আশতার বের হয়ে আসবে এবং তারা তার সামনে আনসার ও বিচারকের ভূমিকা পালন করবে!

আর এই ভাষ্যগুলো অক্ষরে অক্ষরে ও পরিপূর্ণ আমানত সহকারে তাদের প্রখ্যাত আলেমদের অন্যতম বিশিষ্ট আলেমের কিতাব থেকে উদ্ধৃত; আর তিনি হলেন আল-শাইখ আল-মুফিদ (الشيخ المفيد)। এই ভাষ্যগুলো সন্দেহাতীতভাবে আলে বাইতের উপর তাদের মিথ্যা ও বানোয়াট সনদের দ্বারা বর্ণিত। যারা ছিল তাদের বিপদ-মুসিবতের অন্যতম কারণ। কেননা, ঐসব মিথ্যাবাদীরাই তাদের দলের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ। আর আল-শাইখ আল-মুফিদ (الشيخ المفيد)-এর কিতাবটি ইরানে প্রকাশিত হয়; আর তার ঐতিহাসিক কপিটি আমাদের নিকট সংরক্ষিত ও মওজুদ আছে।

রাজ‘আর আকীদা

[আবূ বকর এবং ওমরকে মাহদী’র যামানায় গাছের উপরে ফাঁসি দেয়া হবে!]

শী‘আদের মৌলিক আকিদার মধ্যে অন্যতম আকিদা হচ্ছে ‘রাজ‘আ’ (الرجعة) আকিদা এবং তার আলোকে মুসলিম শাসকদের বিচার-ফয়সালা করা। এই আকিদায় বিশ্বাসী ছিলেন তাদের আলেম ‘আমালী আল-মুরতাজা’ (أمالي المرتضى) নামক গ্রন্থের লেখক সাইয়্যেদ আল-মুরতাজা; আর তিনি হলেন কবি শরিফ আর-রেদীর ভাই এবং ‘নাহজুল-বালাগাহ’ (نهج البلاغة) নামক কিতাবের মধ্যে বৃদ্ধি করার মত জালিয়াতির কাজে তিনি তার সহকারী। সম্ভবত এই ধরনের জালিয়াতির পরিমাণ ছিল কিতাবের এক তৃতীয়াংশের বেশি। আর তা হচ্ছে সে অংশ যাতে রয়েছে সাহাবীগণের দোষ-ত্রুটির বর্ণনা এবং তাদের উপর বানোয়াট দোষ-ত্রুটি চাপিয়ে দেয়া। আলোচিত এই সাইয়্যেদ আল-মুরতাজা তার ‘আল-মাসায়েলুন-নাসেরীয়া’ (المسائل الناصرية) নামক কিতাবে বলেন: নিশ্চয় মাহদী (অর্থাৎ তাদের দ্বাদশ ইমাম,

যাকে তারা আলে মুহাম্মদের প্রতিনিধি নামে ডাকে) তার সময়ে আবূ বকর ও ওমরকে গাছের উপরে ফাঁসি দেয়া হবে; আর ঐ গাছটি ফাঁসির পূর্বে সতেজ থাকেবে কিন্তু ফাঁসির পরে তা শুকিয়ে যাবে!!?

তাদের চিন্তাধারা অপরিবর্তনীয়

শী'আ সম্প্রদায়ের সকল যুগের জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও উযিরদ্বয় আবূ বকর ও ওমর রা.-এর ব্যাপারে এই ধরনের ন্যক্কারজনক অবস্থান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, তাদের কবরকে আলোকিত করুন, তাদের শয্যাস্থানকে শীতল করুন। তাছাড়া ইসলামের সকল জ্ঞানী ব্যক্তি, খলিফা, শাসক, নেতা, মুজাহিদ ও হাফেযের প্রতিও তাদের একই অবস্থান। তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হউন এবং ইসলামের পক্ষ থেকে তাদেরকে ও তাদের পরিবার-পরিজনকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আর আমরা তাদের প্রচারকের নিকট শুনেছি, যিনি ঐক্য সংস্থার অফিসে দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করছিলেন, তিনি যে ব্যক্তির এসব বিষয়ে অধ্যয়ন করার সময়-

সুযোগ নেই তাকে বলছিলেন: এসব আকিদা পূর্ববর্তী যামানায় ছিল; এখন তার ধরন পবির্তন হয়ে গেছে।

বস্তুত তাদের এই ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও প্রতারণামূলক। কারণ, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যেসব কিতাব পড়ানো হয়, তাতে এই ধরনের সকল আকিদাই পড়ানো হয় এবং মাযহাবের প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রথম উপাদান হিসেবেই এসব পাঠকে বিবেচনা করা হয়। আর যেসব গ্রন্থ আমাদের এই যুগে নাজাফ, ইরান ও জাবালে আমেলের আলেমগণ প্রকাশ করে, সেসব গ্রন্থ তাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তার অধিকাংশই ঐক্য বা সমন্বয় প্রচেষ্টার সকল আশা-আকাঙ্খাকেই ধ্বংস করে দেয়।

[ঐক্যের আহ্বায়ক 'আল-খালেসী' আবূ বকর ও ওমরকে আহলে বায়'আতে রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না]

এই জন্য আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করব তাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে, যে প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় ঘোষণা

দিয়ে বেড়ায় যে, সে ঐক্য ও সমন্বয়ের আহ্বায়ক। আর সে লোকটি হচ্ছে, শাইখ মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ মাহদী আল-খালেসী; মিসর ও অন্যান্য দেশে যার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে, যারা ঐক্যের দিকে আহ্বান করে এবং সে লক্ষ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে কাজ করে। এই ঐক্য ও আপোষ-মীমাংসার দিকে আহ্বানকারী—তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তি অধিক সংগত তা নাযিল হোক— সে শায়খাইন তথা আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে ঈমানের মত নিয়ামতকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে!! সে তার "এহইয়াউশ-শরীয়াহ ফি মাযহাবিশ-শী'আ" (إحياء الشريعة في مذهب الشيعة) নামক কিতাবের প্রথম খণ্ডের ৬৩-৬৪ পৃষ্ঠায় বলেন:

"যদিও তারা বলে: নিশ্চয় আবূ বকর ও ওমর আহলে বায়'আতে রিদওয়ানের অন্তর্ভুক্ত; যাদের প্রতি সন্তুষ্টির ব্যাপারে আল-কুরআনে প্রামানিক ভাষ্য রয়েছে:

﴿ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ﴾ [سورة الفتح: ١٨]

"আল্লাহ তো মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছে।—(সূরা আল-ফাতহ: ১৮)

আমরা বলব: যদি তিনি বলতেন (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করেছে) অথবা (তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করেছে), তখনই আয়াত দ্বারা এমন সবার জন্য সন্তুষ্টি সাব্যস্ত হত যারাই বায়‘আত গ্রহণ করেছে; কিন্তু যখন আল্লাহ বলেছেন,

﴿ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ﴾ [سورة الفتح: ١٨]

“আল্লাহ তো মুমিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা তোমার নিকট বায়‘আত গ্রহণ করেছে। —(সূরা আল-ফাতহ: ১৮) তখন আয়াতে সন্তুষ্টি বলতে শুধু ঐ ব্যক্তির উপরই সন্তুষ্টি বুঝাবে, যে ব্যক্তি নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী”!?

প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস বিকৃতি

এ কথার অর্থ হল, শায়েখাইন তথা আবূ বকর ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী নন?! সুতরাং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আওতাধীন নন?! হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র, এটা ডাহা মিথ্যা-অপবাদ; আল্লাহ তুমি আবু বকর ও উমর এর

উপর সন্তুষ্ট হউন এবং তাঁদের উপর পর্যাপ্ত রহমত ও সন্তুষ্টির ব্যবস্থা করুন, আমীন।

আর ইতঃপূর্বে 'আল-যাহরা' (الزهراء) নামক কিতাবের লেখক আল-নাজাফী সাইয়্যেদেনা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র ব্যাপারে যে (আপত্তিকর) কথা বলেছে, তার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। তার দুই হাত ধ্বংস হউক। সে বলেছে: তিনি এমন এক জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন, পুরুষ লোকের বীর্য ব্যতীত তার চিকিৎসা হতো না[16]?!

অতএব, এই দুই শী'আ আলেম যারা আমাদের সমসাময়িক, আর যারা ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সংস্কারের আগ্রহ ও উদ্দীপনার দাবী দীর্ঘকাল ধরে দাবী করে আসছে, যদি সম্মানিত শায়েখাইন আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র ব্যাপারে আধুনিক যুগে প্রকাশিত ও প্রচারিত তাদের গ্রন্থসমূহে আকিদার অবস্থা এই আকীদা পোষণ করে, যাঁরা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ

[16] আমরা এমন লোককে শুধু এটাই বলব, নিজের দোষকে আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে সে সটকে পড়েছে।

মুসলিম অথবা কমপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মুসলিমের অন্তর্ভুক্ত; তখন আমাদের মত লোকজন মাযহাবসমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের জন্য আপোষ-মীমাংসা এবং আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের কী আশা পোষণ করতে পারে? নাকি তারা মুসলিম দুর্গের পঞ্চম বাহিনী[17]?

আর শী'আরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা এবং তাবেঈন ও তাদের পরবর্তী সকল মুসলিম শাসককে এই অপমানজনক স্তরে নামিয়ে দিয়েছে, অথচ তাঁরা হলেন ঐসব ব্যক্তিবর্গ যারা ইসলামের দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এই ইসলামী বিশ্বের উদ্ভাবন করেছেন; তখন তারা তাদের ইমামদেরকে এমন অবস্থানে নিয়ে গেছেন, তাদের ইমামগণ স্বয়ং সেসব অবস্থান থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করে থাকে। আল-কুলাইনী তার 'আল-কাফী' নামক গ্রন্থ যা তাদের নিকট মানের দিক থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের 'সহীহ বুখারী'-এর মত; তাতে তিনি দ্বাদশ ইমামদের অনেক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন যা তাদেরকে মানুষের স্তর থেকে দেব-মূর্তির যুগের গ্রীক জাতির মা'বুদ তথা দেবতার পর্যায়ে উপনীত করেছে। আমরা যদি 'আল-

[17] পঞ্চম বাহিনী বলতে বুঝায়, শত্রুদের অনুচর।

কাফী’ ও তাদের প্রথম শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য অপরাপর গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃতিসমূহ নকল করতে চাই, তবে তাতে এক বিশালাকারের ভলিউম তৈরি হবে। এই জন্য আমরা ‘আল-কাফী’ কিতাব থেকে শুধু ভাষ্যবিশিষ্ট কতগুলো অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করাকে যথেষ্ট মনে করছি। যেমন:

অধ্যায় (بَاب), ইমামগণ সকল জ্ঞানে জ্ঞানী, যে জ্ঞান ফেরেশতা ও নবী-রাসূলদের কাছে ছিল।[18]

অধ্যায় (بَاب), ইমামগণ জানেন তারা কখন মৃত্যু বরণ করবেন এবং তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই মৃত্যু বরণ করবেন।[19]

অধ্যায় (بَاب), ইমামগণ যা হয়েছে এবং যা হবে সবই জানেন, তাদের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।[20]

অধ্যায় (بَاب), ইমামদের নিকট সকল কিতাব বিদ্যমান আছে; তারা বিভিন্ন ভাষায় এগুলো অনুধাবন করেন।[21]

---

[18] আল-কাফী, হা.১/২৫৫ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[19] আল-কাফী, হা.১/২৫৮ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[20] আল-কাফী, হা.১/২৬০ কিতাব আল-হুজ্জাত।

অধ্যায় (بَاب), শুধু ইমামগণই সম্পূর্ণ কুরআন সংকলন করেছেন এবং তারাই শুধু পুরা কুরআনের জ্ঞান রাখেন।[22]

অধ্যায় (بَاب), ইমামদের নিকট নবীদের নিদর্শন (মু'জিযা)সমূহ থেকে যা কিছু আছে।[23]

অধ্যায় (بَاب), ইমামদের নিকট কোন সমস্যা দেখা দিলে তারা দাঊদ ও দাঊদ পরিবারের বিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করে?! এবং কোন দলীল-প্রমাণ চায় না।[24]

অধ্যায় (بَاب), মানুষের হাতে কোন সঠিক কিছু নেই যতক্ষণ না তা ইমামদের নিকট থেকে আসবে এবং ইমামদের নিকট থেকে যা আসে নি, এমন প্রত্যেক বস্তুই বাতিল।[25]

অধ্যায় (بَاب), সমস্ত পৃথিবীই ইমামের।[26]

---

[21] আল-কাফী, হা.১/২২৭ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[22] আল-কাফী, হা.১/২২৮ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[23] আল-কাফী, হা.১/২৩১ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[24] আল-কাফী, হা.১/২৯৭ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[25] আল-কাফী, হা.১/৩৯৯ কিতাব আল-হুজ্জাত।

ইমামদের জন্য গায়েবের জ্ঞান সাব্যস্তকরণ

শী‘আরা তাদের বারো জন ইমামের জন্য গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া এবং তারা মানবীয় গুণাবলীর উর্ধ্বে হওয়া[27] ইত্যাদি যা যা দাবি করে, ঐসব ইমামগণ তাদের নিজেদের জন্য কখনও তা দাবি করেন নি; কারণ, তারা অর্থাৎ শী‘আরা আল্লাহ তা‘আলা গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ে যেমন আকাশ ও যমিন সৃষ্টি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা সম্পর্কিত যেসব ওহী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করেছেন, তা মেনে নিতে অস্বীকার করে। আর এগুলো ‘রিসালাতুল ইসলাম’

---

[26] আল-কাফী, হা.১/৪০৭ কিতাব আল-হুজ্জাত।

[27] বরং তারা আলী রা. থেকে বর্ণনা করে যে, তিনি বলেন: “আমি মর্যাদাবান ও ক্ষমতাবান; আমি এমন ব্যক্তি, যে জীবন ও মৃত্যু দান করি। আর আমি প্রথম ও শেষ; প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য।” যেমন শাইখ আল-মুফীদের ‘আল-ইখতিসাস’ (الاختصاص) নামক কিতাবে এই বর্ণনাটি এসেছে। অথচ এই গুণাবলী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য হতে পারে না। তাদের অনুরূপ আরও একটি বক্তব্য হল: “আমাদের ইমামদের অবস্থান এত উপরে যে, সে পর্যন্ত আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতা ও নবী-রাসূলগণও পৌঁছাতে পারে না।” — আল-খুমাইনী, ‘আল-হুকুমাতুল-ইসলামীয়া’ (الحكومة الإسلامية), পৃ. ৫২

(رسالة الإسلام) নামক ম্যাগাজিনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়কারী সংস্থার অফিস থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে; উক্ত ম্যাগাজিনের চতুর্থ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যার ৩৬৮ পৃষ্ঠায় লেবাননের শী'আ আইনের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান, -যাকে শী'আরা বর্তমান কালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় আলেম হিসেবে গণ্য করে থাকে- তার কলমে তা প্রকাশ পায়। তিনি সেই ম্যাগাজিনে মিন ইজতিহাদাতিশ-শী'আতিল-ইমামীয়া" (من اجتهادات الشيعة الإمامية) শিরোনামে, তাদের মুজতাহিদ শাইখ মুহাম্মদ হাসান আল-আশতিয়ানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার 'বাহারুল-ফাওয়ায়েদ' (بحر الفوائد) নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ২৬৭ পৃষ্ঠায় বলেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কিত কোন বক্তব্য দেন, যেমন অযু ভঙ্গের কারণ, হায়েয ও নিফাসের বিধান; তখন তিনি যা বলেছেন, তা বিশ্বাস করা এবং আমল করা ওয়াজিব। আর যখন তিনি গায়েবী বিষয় তথা আকাশ ও জমিন সৃষ্টি এবং জান্নাতের হূর ও অট্টালিকার ব্যাপারে কোন তথ্য পেশ করেন, তখন দ্বীন হিসেবে মেনে নেয়া ওয়াজিব নয়; যদিও এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট জ্ঞান (العلم) মাধ্যমে তা প্রমাণিত হোক না কেন। (অর্থাৎ এই তথ্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে বিশুদ্ধভাবে এসেছে তা জানার পরও তা দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়) আর যদি বিষয়টি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লোম থেকে) প্রাধান্যপ্রাপ্ত জ্ঞান (الظن) মাধ্যমে আসে তবে সেটা গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না। !?

হে আল্লাহ, কি আশ্চর্য! তারা ইমামদের উপর মিথ্যারোপ করে; অতঃপর তাদের দিকে গায়েব জানার সম্পর্ক জুড়ে দেয় এবং তারা তা বিশ্বাসও করে। অথচ ইমামদের প্রতি এই ধরনের গায়েবের সম্পৃকততার কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। অথচ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং যা অকাট্য দলীল হিসেবে প্রমাণিত; তারা তাদের নিজেদের জন্য সেই সব গায়েবী সংবাদকে দীন হিসেবে গ্রহণ করা অনাবশ্যক বলা বৈধ মনে করে। উদাহরণস্বরূপ আকাশ ও যমিন সৃষ্টি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল-কুরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আল-কুরআনের বক্তব্য হল:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلۡهَوَىٰٓ ۝٣ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَحۡيٞ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾[سورة النجم: ٣-٤]

“এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এ তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।” —(সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

আর যে সব গায়েবী জ্ঞানের বিষয়ের সংবাদ তারা তাদের ইমামদের জন্য নির্ধারণ করে, তার মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে সব গায়েবী বিষয়ের সংবাদ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তার মধ্যে যদি তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে, এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, শী‘আগণ (পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও) যে সমস্ত গায়েবী সংবাদ তাদের বারো জন ইমামের জন্য আন্দাজ-অনুমান করে সাব্যস্ত করে থাকে তার তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে গায়েবী সংবাদের ব্যাপারে যা আল-কুরআন, মুতাওয়াতির ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তা অতি নগন্য !!।

শী‘আদের নিকট বারো ইমামের গায়েব জানার বিষয়ে যে সব বর্ণনা রয়েছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অনুসারী হাদিসের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাছাইকারী অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট

সে সকল বর্ণনার বর্ণনাকারীরা মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত; কিন্তু তাদের অনুসারী শী‘আগণ ঐ দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না এবং উল্টো তারা ইমামদের গায়েব জানার ব্যাপারে তাদের ইমামদের থেকে তারা যা বর্ণনা করেছে সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। অথচ সে একই সময়ে ঐক্যসংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত ‘রিসালাতুল-ইসলাম’ (رسالة الإسلام) ম্যাগাজিনটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে গায়েবী বিষয়ে যা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তা বিশ্বাস করা ওয়াজিব না হওয়ার দাবিতে লেবাননে শী‘আদের শরীয়া আইনের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও তাদের গবেষক শাইখ মুহাম্মদ হাসান আল-আশতিয়ানী হাত তালি দিতে লাগল এবং রীতিমত কিতাব লেখা শুরু করে দিল। আর তারা চাচ্ছিল রিসালাতে মুহাম্মদীয়া মিশনকে অযু ভঙ্গের কারণ, হায়েয ও নিফাসের বিধানের মত ফিকহ শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার মাসআলার মধ্যে বন্দী করে রাখতে।

ইমামদের মর্যাদা রাসূলের উপর

যখন তারা তাদের ইমামদের মর্যাদাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার উপর সমুন্নত করার ধৃষ্টতা

প্রদর্শন করে; অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওহী আসত, পক্ষান্তরে বারো ইমামের কেউই তাদের নিজেদের জন্য ওহীর দাবি করেন নি; এমতাবস্থায় এত কিছুর পরেও আমাদের ও তাদের মাঝে কোন ধরনের ঐক্য বা সমন্বয়সম্ভব হবে, তা আমাদের বোধগম্য নয়?!

আর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ পর্যবেক্ষনে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শী'আ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে তাদের বিশেষ ও সাধারণ অবস্থান হচ্ছে এই যে, যখন কোন ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিশালী ও মজবুত হয়, তখন তারা 'তাকিয়্যা'র আকিদায় বিশ্বাসী হয়ে তাদের মৌখিক চাটুকারিতা দ্বারা তার তোষামোদ করেছে, যাতে তারা তার সুযোগ-সুবিধাগুলো শোষণ করে নিতে পারে এবং তার কেন্দ্রগুলো দখল করে নিতে পারে। অতঃপর যখন তা (ইসলামী রাষ্ট্র) দুর্বল হয়ে যাবে অথবা শত্রু কর্তৃক আক্রমনের শিকার হবে, তখন তারা আক্রমনকারীদের দলে শামিল হবে এবং উল্টো তার বিপক্ষে ভূমিকা পালন করবে। উমাইয়া খিলাফতের শেষের দিকে তাদের খলিফাদের বিরুদ্ধে যখন আব্বাসীয়রা বিদ্রোহ করল, তখন তাদের ভূমিকা এমনই ছিল। বরং তাদের বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের

বিদ্রোহ ছিল অনেকটা শী‘আদের প্ররোচনা, উৎসাহ ও ষড়যন্ত্রের ফসল!

অতঃপর যখন আব্বাসীয় খিলাফতের অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল হালাকু খান ও মূর্তিপূজক মোগলগণ কর্তৃক ইসলামী খিলাফত, গৌরবের প্রধান নগরী ও শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র দখলের মাধ্যমে, তখন আব্বাসীয় বংশের শাসকদের সাথেও তাদের এই ধরনের ন্যক্কারজনক ভূমিকা ছিল।

[হালাকু ও মূর্তিপূজক মোগলদের কাফেলায় নাসির আল-তুসী[28] ও ইবনুল 'আলকামী]

অবশেষে শী'আদের বিজ্ঞ আলেম নাসির আত-তুসী আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতা'সিমের চাটুকারিতায় ৬৫৫ হিজরিতে তার পতন পর্যন্ত তাকে উৎসাহ দিয়ে এবং বাগদাদ নগরীতে ইসলামের আশু বিপদজনক পরিস্থিতি তুলে ধরে কবিতা রচনা করছিলেন। এমতাবস্থায় আগমন ঘটল অবিরাম রক্তপাতের সূচনাকারী হিসেবে হালাকু খানের! তার সাথে সে (নাসির আত-তুসী) মুসলিম নর-নারী এবং শিশু ও বৃদ্ধদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালনায় ইন্ধন যোগাতে থাকে! আর ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ কিতাবসমূহ দাজলা নদীতে ডুবিয়ে দিতে সম্মতি প্রদান করে; শেষ পর্যন্ত লিখিত

---

[28] খোমেনী তার 'আল-হুকুমাতুল-ইসলামীয়া' (الحكومة الإسلامية) নামক কিতাবের ১০৮ পৃষ্ঠায় খাজা নাসিরুদ্দীন আল-তুসী'র প্রশংসা করেছেন এবং যারা ইসলামের সুমহান খেদমতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাকে তাদের অন্যতম একজন বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আল-খূওয়ানসারী তার 'রওযাতুল জান্নাত' (روضات الجنات) নামক কিতাবের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় তার প্রশংসা করেছেন, যা ১৩৬৭ হিজরিতে তেহেরান থেকে প্রকাশিত।

কিতাবসমূহের কালিতে বহু দিন ও রাত ধরে দাজলা নদীতে কালো পানি প্রবাহিত হতে থাকে। যার কারণে ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, কবিতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শরীয়তের জ্ঞান এবং প্রথম সারির পূর্ববর্তী ইমামদের গ্রন্থসমূহসহ ইসলামী ঐতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য সম্পদের এক বিরাট অংশ বিনষ্ট হয়ে গেছে; যা দীর্ঘকাল ধরে ঐ সময় পর্যন্ত স্বগৌরবে বিদ্যমান ছিল। ঐ সাংস্কৃতিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনার সময় সাহিত্য সম্পদের যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে, ইতঃপূর্বের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।[29]

[29] এখানে ইঙ্গিত দেয়া দরকার যে, হালাকু খানের নাতি সুলতান গাযান যখন ৬৭৭ হিজরিতে শামদেশ (বর্তমান সিরিয়া) দখল করার জন্য আগমন করে, তখন তার উযির ছিল নাসিরুলকুফর (কুফরের সাহায্যকারী) আল-তুসী';যাকে নাসিরুদ্দিন(দীনের সাহায্যকারী) নামে শী'আরা অভিহিত করে, তারই নাতি। সে দামেস্কে মান-ইজ্জত লুণ্ঠন, রক্তপাত ও জ্ঞানসমৃদ্ধ বই-পুস্তক চুরিসহ বহু অপকর্ম করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ইমাম মুজাহিদ শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাকে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য নিয়োজিত করলেন এবং আল্লাহ তাকে ৭০১ হিজরিতে 'শকহব' (شقحب) এর যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে পরাস্ত করেন।

আল-আলকামী ও ইবন আবিল হাদীদের খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা

আর শী‘আদের গুরু নাসির আল-তুসী’র সাথে লুটপাটের এই মহোৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল তার দুই বন্ধু; তাদের একজন হল শী‘আ উযির মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-‘আলকামী, আর অপরজন হল মু‘তাযেলী লেখক (প্রায় শী‘আ) আবদুল হামিদ ইবন আবিল হাদীদ, সে ছিল ইবনুল ‘আলকামী’র ডান হাত। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের শত্রু হিসেবে তার জীবনপাত করেছে; যার প্রমাণ হল ‘নাহজুল-বালাগাহ’ (نهج البلاغة) নামক কিতাবটি। সে তার কদর্যপূর্ণ ও মিথ্যা-বানোয়াট ব্যাখ্যা দ্বারা সেটাকে পরিপূর্ণ করেছে, যার মাধ্যমে সে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। আর সে অনবরত তার দ্বারা যারা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল অতীত বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা প্রতারিত হয়েছে, এমনকি আমাদের বুদ্ধিমান লেখকবৃন্দও অনেক সময় প্রতারিত হয়েছে!![30]

---

[30] নাজাফ সম্মেলনের সদস্য আল্লামা আল-সুওয়াইদী যার আলোচনা এই ভূমিকার পরে আসবে; তার পক্ষ থেকে এই ইবন আবিল হাদীদের জওয়াব

বস্তুত ইবনুল ‘আলকামী এমন ব্যক্তি, যে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে খলিফা আল-মুসতা‘সিমের উদারতার সম্মুখীন হল; আর তিনি (খলিফা) তাকে তার উযিররূপে গ্রহণ করে পুরস্কৃত করলেন। ফলে যার প্রতি তিনি ইহসান করলেন, ইহসানের প্রতিদান স্বরূপ সে খেয়ানত ও হীন মানসিকতার শিকড় গেড়ে বসল এবং তাকে উচ্ছেদ করে ছাড়ল।

আর শী‘আগণ প্রথম থেকে এই পরবর্তী যুগ পর্যন্ত একাধারে অন্যের কষ্টে আনন্দ উপভোগ করে আসছে এবং তারা ইসলামের সাথে শত্রুতা করে তাকে (ইসলামকে) হালাকু খানের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে ফেলে দিয়ে মজা উপভোগ করে। কোন ব্যক্তি চাইলে তাদের লিখিত সকল জীবনীগ্রন্থের মধ্যে নাসির আল-তুসী’র জীবনী পাঠ করতে পারে। সবশেষে আল-খূওয়ানসারী রচিত ‘রওযাতুল জান্নাত’ (روضات الجنات) নামক অপর আরও একটি জীবনীগ্রন্থ

দেয়া হয়েছে। এই জন্য তিনি তার প্রায় এক হাজার পাতার “আল-সারেম আল-হাদীদ ফি আল-রদ ‘আলা ইবন আবি আল-হাদীদ” (الصارم الحديد في الرد ابن أبي الحديد) নামক কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেছেন; যাকে সম্মানিত ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাউসারী তার প্রবন্ধমালার ১৫৫ পৃষ্ঠায় একটি উপকারী গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেছেন।

আছে, যা রক্তপাতকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের প্রশংসায় ভরপুর; ইসলামের উপর আপতিত ঐ দিনকার বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বা অন্যের কষ্টে আনন্দ উপভোগ; বিশেষ ও ব্যাপক এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ক্রোধ প্রশমিত করা এবং মুসলিম নর-নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের উপর যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছে, যা বর্ণনা করে আনন্দ অনুভব করতে সবচেয়ে বড় শত্রু ও পশুর চেয়েও কঠোর পাষণ্ড অন্তরও সায় দেয় না; সে ঘটনাগুলো বর্ণনা করে সে গ্রন্থে পৈশাচিক আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়টি বিস্তারিত ও ব্যাপক হয়ে গেল; তবে তাতে শী'আদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে গৃহীত ভাষ্যসমূহ সংক্ষেপ করা হয়েছে। আর আলোচনাটি শেষ করব অপর একটি নস বা ভাষ্য দ্বারা যা (শী'আ-সুন্নী) ঐক্যের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত; যাতে প্রত্যেক মুসলিম জানতে পারে, বিভিন্ন দল ও অপরাপর মাযহাবসমূহের অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য সম্পর্কে, বিশেষ করে শী'আদের সাথে তার অসাধ্যতা সম্পর্কে; আর এটাই তাদের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি; যার বর্ণনা নিম্নরূপ:

শী'আদের অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক আল-খুওয়ানসারী ১৩৬৭ হিজরিতে তেহরান থেকে প্রকাশিত তার 'রওযাতুল জান্নাত' (روضات الجنات) নামক কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ৫৭৯ পৃষ্ঠায় নাসির আত-তুসী'র দীর্ঘ জীবনী বর্ণনার সময় উল্লেখ করেন যে, তার "বাস্তব সুগঠিত এবং সত্য ও বাস্তবতার আলোকে প্রকাশিত" বক্তব্যগুলোর একটি হলো "তিহাত্তরটি ফিরকার মধ্য থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল বা 'ফিরকাতুন নাজিয়া' (الفرقة الناجية) সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণের কথা, আর তা যে ইমামীয়া তা বর্ণনা করা।" সে বলে:

[ফিরকা নাজিয়া (الفرقة الناجية) হল ইমামীয়া!]

"নিশ্চয় আমি সকল মাযহাবকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি এবং সেগুলোর নিয়ম-নীতি ও শাখা-প্রশাখার ব্যাপারে অবগত হয়েছি। অতঃপর আমি ইমামীয়া ছাড়া বাকি সকল মাযহাবকে ঈমানের নীতিমালার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মিল পেয়েছি; যদিও তারা কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকে; যেগুলো সাব্যস্ত করা আর না করা ঈমানের ব্যাপারে সমান কথা। অতঃপর আমি ইমামীয়া সম্প্রদায়কে তাদের সবার নীতিমালার সম্পূর্ণ বিরোধী হিসেবে পেয়েছি। সুতরাং ইমামীয়াদের নীতিমালার বিপরীত কোন একটি

ফিরকা যদি মুক্তি বা নাজাতপ্রাপ্ত ধর্তব্য হয়, তবে সকল ফিরকা বা দলই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে; আর [যেহেতু তা তার নিকট সম্ভব নয়; সেহেতু] তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত দল মানেই ইমামীয়া সম্প্রদায়, অন্য কেউ নয়"!

আহলে বাইতের কথা মানলেই কেবল মুক্তি

[দুই সাক্ষ্যই জান্নাতে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট নয়!]

আল-খূওয়ানসারী বলে: সাইয়্যেদ নিয়ামতুল্লাহ আল-মূসাওয়ী এই উদ্ধৃতি বর্ণনা করার পর বলে: "এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, সকল সম্প্রদায়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: «من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» (যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে)-এর উপর ভিত্তি করে শুধু দুই সাক্ষ্য (الشهادتين)-কে পরিপূর্ণ নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করে। আর এই ইমামীয়া সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ বিশ্বাস হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নাজাত হবে না, যতক্ষণ না দ্বাদশ ইমাম পর্যন্ত আহলে বাইতের (নবী পরিবারের) সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না হবে এবং তাদের শত্রুদের থেকে মুক্ত না হবে [অর্থাৎ আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত শী'আগণ

ব্যতীত যে কেউ শাসক ও শাসিত হিসেবে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের সবার থেকে সম্পর্ক ত্যাগ ঘোষণা করতে হবে]। কারণ এই বিশ্বাসটি সকল সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন; যার উপর নাজাতের বিষয়টি আবর্তিত হবে।”

শী‘আরা মুসলিমদের সাথে মূলনীতিতেই বিরোধী, শুধু শাখা-প্রশাখাজনিত মাসআলায় নয়

আল-তুসী, আল-মূসাওয়ী ও আল-খূওয়ানসারী সত্য বলেছে! আবার তারা মিথ্যাও বলেছে!!

তারা সত্য বলেছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়গুলো মূলনীতিমালার ক্ষেত্রে একে অপরের কাছাকাছি এবং গৌণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন রকম; এই জন্য মূলনীতিমালার ক্ষেত্রে কাছাকাছি অবস্থানে অবস্থিত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আপোষ-মীমাংসা ও সমন্বয় সাধন সম্ভব। কিন্তু এই আপোষ-মীমাংসা ইমামীয়া শী‘আ সম্প্রদায়ের সাথে অসম্ভব। কারণ, তারা তাদের মূলনীতিমালার ক্ষেত্রে সকল মুসলিমের বিরোধী; আর তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের কাউকে পছন্দ করে না, যতক্ষণ না তারা (জিবত ও তাগুত) আবূ বকর ও ওমর রা. এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অধস্তনদেরকে লা‘নত বা

অভিশাপ দেবে; আর যতক্ষণ না তারা শী'আ নয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করবে, এমনকি যদিও সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের মধ্য থেকে 'আলে বাইত' (নবী পরিবার) হয়, তবুও!! যে কন্যাদেরকে বিয়ে করে তাঁর (রাসূলের) সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন যুন নূরাইন ওসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমাইয়া বংশের বিচক্ষণ ব্যক্তি 'আস ইবন রবী' যার প্রশংসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ভর্তি সকল মুসলিমকে সামনে নিয়ে মিম্বরে বসে করেছেন, যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ জাহেলের কন্যাকে বিয়ে করে তাকে তাঁর চাচার কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা[31]-এর সতীন বানানোর ইচ্ছা পোষণ করেন এবং তিনি (ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর পিতার নিকট এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন।

[31] ভাইয়ের কন্যাকে ব্যক্তির বাপ-চাচাদের দিকে সম্পর্কিত করে বলা হয়, সে তার চাচার কন্য; এই জন্য লেখক বলেছেন: ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু'র চাচার কন্যা, অথচ তিনি হলেন তার চাচার ছেলের কন্যা।

আর শী‘আরা কোন মুসলিমের উপর ঐ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয় না, যতক্ষণ না তারা আরও সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেয় ইমাম যায়েদ ইবন আলী যাইনুল ‘আবেদীন ইবন হোসাইন ইবন আলী ইবন আবি তালিব ও আলে বাইতের সকল সদস্যের সাথে, যারা তাদের বদ্ধ আকিদার ক্ষেত্রে রাফেযী পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হয় নি, যার উল্লেখযোগ্য একটি আকিদা হচ্ছে এই কথা দাবি করা যে, আল-কুরআন বিকৃত।

বস্তুত শী‘আরা তাদের সকল যুগে ও সকল স্তরেই এই (কুরআন বিকৃতির) আকীদা পোষণ করে থাকে; যা তাদের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাদের তরেই লিপিবদ্ধ করেছেন তাদেরই একান্ত প্রিয় ও আন্তরিক প্রতিভাবান ব্যক্তি আলহাজ্জ মির্জা হোসাইন ইবন মুহাম্মদ তকী আল-নূরী আল-তাবারসী তার ‘ফাসলুল খিতাব ফি ইসবাতে তাহরীফে কিতাবে রাব্বিল আরবাব’ নামক কিতাবে; যিনি এই কিতাবের প্রতিটি ছত্র লেখার মত ন্যক্কারজনক অপকর্মটি সম্পন্ন করেছেন এমন একজন সম্মানিত সাহাবী কুফার আমীর মুগীরা ইবন শু‘বা রাদিয়াল্লাহু আনহু কবরের পাশে অবস্থান করে; যে কবরকে শী‘আরা মনে করে যে, এটাই আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র কবর।

শী‘আরা তাদের সাথে ঐক্য, আপোষ-মীমাংসা ও সমন্বয় সাধনের জন্য আমাদের উপর শর্তারোপ করেছে যে, তাদের সাথে আমরাও যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে অভিশাপ দেই এবং যারা তাদের মতাদর্শের অনুসারী নয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করি; এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাদের ও তাঁর শ্রেষ্ঠ বংশধরদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদ করি, যার শীর্ষে রয়েছেন যায়েদ ইবন যাইনুল ‘আবেদীন; এবং তাদেরকেও যেন অভিশাপ দেই, যারা রাফেযীদের অপকর্মের প্রতিবাদ ও নিন্দাজ্ঞাপনে তাঁর (যায়েদ ইবন যাইনুল ‘আবেদীনের) পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। আর এটাই নাসির আল-তুসী থেকে বর্ণিত ভাষ্যের বাস্তব সত্য দিক। এ ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করেছে সাইয়্যেদ নিয়ামতুল্লাহ আল-মূসাওয়ী ও মির্জা মুহাম্মদ বাকের আল-মূসাওয়ী আল-খূওয়ানসারী আল-ইস্পাহানী। আর এ ক্ষেত্রে ‘তাকিয়্যা’ নীতির প্রকাশকারী অথবা গোপনকারী কোন শী‘আ-ই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে না।

আর যে বিষয়টিতে তারা (আল-তুসী, আল-মূসাবী ও আল-খূওয়ানসারী) মিথ্যা বলেছে, তা হল তাদের দাবি যে, শী‘আগণ ব্যতীত সকল মুসলিমের মতে, দুই সাক্ষ্য (الشهادتين) উচ্চারণের

দ্বারাই আখেরাতে পরিপূর্ণ মুক্তি পাওয়া যাবে। অথচ যদি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকত, তবে তারা জানতে পারত যে, আমাদের মতে, দুই সাক্ষ্য (الشهادتين) হল ইসলামের মধ্যে প্রবেশের ঠিকানা বা শিরোনাম। আর এই শাহাদাতাইনের (الشهادتين) স্বীকৃতিদাতা যদি (বিপক্ষের) যোদ্ধাও হয়ে থাকে, তবে দুনিয়াতে তার জান ও মালের নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু আখেরাতে তার নাজাত হবে ঈমানের বিশুদ্ধতার দ্বারা। আর এটা জানা আবশ্যক যে, ঈমানের কতগুলো ফরয, শরয়ী বিধান, হদ ও সুন্নাত রয়েছে; যেমনটি আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবন আবদুল আযীয র. বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলো পূরণ করবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে; আর যে ব্যক্তি এগুলো পূরণ করবে না, তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না। এমনকি তাদের দ্বাদশ ইমামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাও সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত কোন কাজ নয়। কারণ, সে হল এক কল্পিত ব্যক্তি, বানোয়াট প্রক্রিয়ায় হাসান আল-‘আসকারীর মত নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কারণ, তার সহোদর ভাই জাফর[32] তার রেখে যাওয়া যাবতীয় সম্পত্তি

[32] তিনি হলেন জাফর ইবন আলী আল-‘আসকারী, হাসান আল-‘আসকারী’র সহোদর ভাই।

ওয়ারিশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কেননা, হাসান আল-আসকারীর কোন সন্তান ছিল না।

আর আলাওয়ী বা আলীবংশীয়দের জন্য জন্মনিবন্ধন খাতা ছিল, যার দেখাশুনা করতেন ঐ যামানার নকীব বা প্রধান ব্যক্তি; তাদের কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করলেই তাতে তার নাম লিপিবদ্ধ করা হয়ে যেত। আর তাতে হাসান আল-'আসকারী'র কোন সন্তানের জন্ম নাম লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আর তৎকালীন সময়ের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ জানেন না যে, হাসান আল-'আসকারী কোন পুত্র সন্তান রেখে মারা গেছেন। কিন্তু যখন হাসান আল-'আসকারী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল, তখন তাদের ইমামের অনুসারীদের মতে, ইমামতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গেল এবং তারা দেখল যে, তার মৃত্যুর কারণে মাযহাবের মৃত্যু ঘটছে; আর তারা হয়ে গেলেন ইমামীই রইলো না; কারণ, এখন আর তাদের কোন ইমাম নেই।

নুসাইরিয়া ফির্কার উদ্ভব

অতঃপর তাদের শয়তানদের মধ্য থেকে বনী নুমাইর গোত্রের দাসদের মধ্য থেকে মুহাম্মদ ইবন নাসির নামক এক শয়তান

তাদের জন্য এক অভিনব দর্শন আবিষ্কার করল যে, হাসান আল-‘আসকারী’র এক সন্তান রয়েছে, যে তার পিতার ভূগর্ভস্থ কক্ষে[33] লুকায়িত; যাতে সে এবং তার সঙ্গী-সাথীরা সাধারণ শী‘আগণকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়; আরও ধোঁকা দিতে সক্ষম হয় তাদের ধনীদেরকে বিদ্যমান (ভূগর্ভস্থ কক্ষে লুকায়িত) ইমামের নামে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায়করণ দ্বারা! আর তারা তাদের মিথ্যা দাবির সাথে সর্বদা সম্পর্ক রাখল এই বলে যে, তারা নিজেরাও ইমামীয়া’র অন্তর্ভুক্ত। আর সে (মুহাম্মদ ইবন নাসির) পরিকল্পনা করল যে, সে হবে তার সম্প্রদায় ও কথিত ইমামের মধ্যে কল্পিত ভূগর্ভস্থ কক্ষের ‘দরজা’ (الباب) এবং যাকাতের নামে আদায়কৃত সকল সম্পদের মালিক; কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের সকল কুচক্রীমহল তার শয়তান বন্ধুরা তার বিরোধিতা করল এবং তারা

[33] তার পিতার ঘরের মধ্যে যদি ভূগর্ভস্থ কক্ষ থাকে, তবে তারা তো সে কক্ষ থেকে অনেক দূরে এবং তাদের জন্য সেখানে প্রবেশের কোন অধিকার নেই; কারণ, তার নিয়ন্ত্রণ হাসান আল-‘আসকারী’র ভাই জাফরের হাতে। আর তিনি অকপটে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, হাসান আল-‘আসকারী’র কোন সন্তান নেই; কল্পিত ভূগর্ভস্থ কক্ষের মধ্যেও ছিল না, তার বাইরেও ছিল না। আর যদি বলা হয় যে, সে ভূগর্ভস্থ অনেক কক্ষে লুকায়িত আছে তবে সেটা থেকে তারা কিভাবে তাকে খুঁজে বের করবে!?

সিদ্ধান্ত নিল যে, ‘দরজা’ (البَاب) হবে একজন তেল বা ঘি বিক্রেতা, হাসান আল-‘আসকারী ও তার পিতার ঘরের দরজায় যার একটি দোকান রয়েছে; এবং তারা যার নিকট থেকে তাদের আবাসিক প্রয়োজন মিটাত। সুতরাং যখন তাদের মধ্যে এই মতবিরোধ দেখা দিল, তখন তাদের নিকট থেকে এই ষড়যন্ত্রের আবিষ্কারক পৃথক হয়ে তার নিজের নামে ‘নুসাইরীয়া’[34] মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে।

দরজা ও ভূগর্ভস্থ কক্ষের কাহিনী

পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ইবন নুসাইর এর সঙ্গী-সাথীগণ তাদের কথিত দ্বাদশ ইমামকে প্রকাশ করার জন্য আরেকটি নতুন কৌশল পাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল; সে পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা চাইল তার জন্য একটি বিয়ের ব্যবস্থা করবে, যাতে তার ছেলে এবং নাতী হতে পারে, যারা ইমামীয়া সম্প্রদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে; আর তাদের মাধ্যমেই ইমামীয়া সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। কিন্তু যখন তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ

---

[34] বর্তমানে সিরিয়ায় সংখ্যালঘু নুসাইরিয়া সম্প্রদায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। [সম্পাদক]

ধরনের তথ্য প্রকাশ করাটা অচিরেই তাকে আলীবংশীয় নেতৃবৃন্দ ও সকল আলীবংশীয়গণ এবং তাদের চাচাতো ভাই বনী আব্বাসের খলিফা ও তাদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যাবে; তাই তারা বলল যে, তিনি ভূগর্ভস্থ কক্ষের মধ্যে বিদ্যমান আছেন এবং তার ছোট ও বড় দু'টি অন্তর্ধান রয়েছে ... ইত্যাদি ইত্যাদি; যে ধরনের কাহিনী কোন দিন কোথাও এমনকি গ্রিকদের পৌরাণিক কাহিনীসমূহেও শোনা যায় নি। এরপরও আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে স্বীয় নিয়ামত দ্বারা ধন্য করেছে, ঐসব মুসলিম ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে কি তারা আশা করে যে, তারা এসব মিথ্যা-বানোয়াট কাহিনীকে সত্য বলে মেনে নেবে, যাতে তাদের এবং শী'আদের মাঝে একটা মিল-মিশ ও ঐক্য সাধন করা যায়?! অসম্ভব, অসম্ভব! যদি-না গোটা ইসলামী বিশ্ব তার অবস্থান পরিবর্তন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি "পাগলা গারদে" রূপান্তরিত না হয়ে যায়!! আর আকল বা বিবেকের মত নিয়ামত দান করার কারণে সকল প্রশংসা নিবেদিত আল্লাহ তা'আলার জন্য; কেননা, তা-ই হল দায়িত্ব অর্পন করার মানদণ্ড। আর তা বিশুদ্ধ ঈমানের পরপরই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানজনক নিয়ামত।

মুসলিমদের বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক

মুসলিমগণ বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী প্রত্যেক মুমিনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে থাকে। আর আলে বাইতের (নবী পরিবারের) সকল সৎলোক এই নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত, যারা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। আর মুমিনগণ যাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, সেই তালিকার শীর্ষে যাঁরা আছেন, তারা হলেন সেই দশজন যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঐ দশজনকে জান্নাতের অধিবাসী বলে ঘোষণা করেছেন, শী‘আগণ কর্তৃক তাঁর (নবীর) এই ঘোষণার বিরোধিতা করাটাই তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে যথেষ্ট। অনুরূপভাবে মুসলিমগণ সকল সাহাবীকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, যাদের কাঁধের উপর ভর করে ইসলাম ও ইসলামী বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী দেশের মাটিতে যাদের রক্ত ঝরার কারণেই সেখানে আজ সত্য ও কল্যাণের বৃক্ষ জন্মেছে। এমন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিবর্গের নামেই শী‘আরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানদের দোহাই দিয়ে মিথ্যাচার করে বলে যে, তাঁরা (সাহাবাগণ) তাঁদের (আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সন্তানদের)

শত্রু; অথচ তাঁরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু’র সাথে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতায় ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করেছেন এবং পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সহযোগিতায় ভাই ভাই হয়েই মৃত্যুবরণ করে করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবের সূরা ‘আল-ফাতহ’-এর মধ্যে তাঁদের ব্যাপারে কত চমৎকার গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁদের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾ [سورة الفتح: ٢٩]

“তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।”— (সূরা আল-ফাতহ: ২৯)

সূরা ‘আল-হাদীদে’ বলেছেন:

﴿وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [سورة الحديد: ١٠]

“আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহরই। তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা

ও পরবর্তীরা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ওদের অপেক্ষা, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।”— (সূরা আল-হাদীদ: ১০)

আর আল্লাহ্ তিনি কি তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করবেন? সূরা ‘আলে ইমরান’-এর মধ্যে তিনি আরও বলেছেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [سورة ال عمران: ١١٠]

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। — (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি

[আলী রা.-এর সন্তানদের নাম : আবূ বকর, ওমর ও ওসমান]

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁর ভাই খোলাফায়ে রাশেদার বাকি তিন খলিফার প্রতি আন্তরিক মহব্বতের কারণে তিনি হাসান, হুসাইন ও হানাফিয়্যার সন্তানের পরবর্তী তাঁর সন্তানদের নাম তাঁদের নামে রেখেছিলেন।

সুতরাং আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু' তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে একজনের নাম রেখেছেন 'আবূ বকর'; আরেক জনের নাম রেখেছেন 'ওমর' এবং তৃতীয় জনের নাম রেখেছেন 'ওসমান'। আর তিনি তাঁর বড় মেয়ে উম্মে কুলসুমকে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র নিকট বিয়ে দিয়েছেন।[35]

---

[35] মজার ব্যাপর হল, শী'আদের কোন কোন কিতাবে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যে আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু'র কন্যাকে বিয়ে করেছেন, সে কথার উল্লেখ নেই; বরং তারা উল্লেখ করে যে, তারা

এবং তাঁর (ওমর) শাহাদাতের পর তাঁকে বিয়ে করেছেন তাঁর চাচার ছেলে (চাচাত ভাই) মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ইবন আবি

উম্মে কুলসুমের মত এক মহিলাকে তাঁর (ওমরের) স্ত্রী'র অন্তর্ভুক্ত করে...। আর এটা হল যেমন প্রবাদে বলা হয়: "তার চোখে দিতে চাইলো সুরমা, অতঃপর তাকে করে দিল কানা"!! তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, আবূ লুলু আল-মাজুসী কর্তৃক ওমর রা শাহাদাত বরণ করার পর তার চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইবন জাফর কি আসল উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন, নাকি নকল উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন?! অনুরূপভাবে তিনি (মুহাম্মদ ইবন জাফর) যখন মারা গেলেন, তখন তার ভাই 'আউন কি উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন, নাকি তার মত অন্য কাউকে!?

আর কুলাইনী যুরারা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের উল্লেখ করেছে। সে উম্মে কুলসুমের বিয়ের ব্যাপারে আবূ আবদিল্লাহ আ. থেকে বর্ণনা করে। সে বলল: "এই লজ্জাস্থানটি আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে।"— এ প্রসঙ্গে দেখুন, 'আল-কাফী ফিল-ফুরু' (الكافي في الفروع), হা.১, পৃ. ১৪১, ভারতীয় প্রকাশনা।

বরং আল-তুসী তার 'তাহযীবুল-আহকাম' (تهذيب الأحكام) নামক কিতাবের হা.২/৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, উম্মে কুলসুম ও তাঁর ছেলে যায়েদ ইবন ওমর ইবনুল খাত্তাব উভয়ে একই সময় মারা গেছেন এবং তারা একে অপরের জন্য কোন উত্তরাধিকার রেখে যান নি...। সুতরাং কিভাবে বিয়ের ঘটনাকে অস্বীকার করবে এবং দুর্বল বর্ণনা পেশ করার মাধ্যমে ওমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য উম্মে কুলসুমের সদৃশ কাউকে স্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবে!!

তালিব। অতঃপর তিনি তাঁকে (উম্মে কুলসুমকে) রেখে মারা গেলেন; অতঃপর তাঁকে বিয়ে করেন তার ভাই ‘আউন ইবন জাফর এবং তার নিকটেই উম্মে কুলসুম মারা করেন।

আর আবদুল্লাহ ইবন জাফর (যুল জানাহাইন) ইবন আবি তালিব তার এক ছেলের নাম রাখেন ‘আবূবকর’ এবং অপর এক ছেলের নাম রাখেন ‘মু‘আবিয়া’।

আর এই মু‘আবিয়া অর্থাৎ মু‘আবিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবি তালিব তার এক ছেলের নাম রাখেন ‘ইয়াযিদ’। কারণ, তিনি ইয়াযিদকে উত্তম চরিত্রের মানুষ বলে জানতেন[36]; যেমনিভাবে এই বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন মুহাম্মদ ইবন হানাফীয়া ইবন আলী ইবন আবি তালিব।

---

[36] এই ইজতিহাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে; কারণ, মু‘আবিয়া ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাফর ইবন আবি তালিব ইয়াযিদ ইবন মু‘আবিয়া ইবন আবি সুফিয়ানের নামেই তার ছেলের নাম রেখেছেন, এমন কোন প্রমাণ নেই। আর ইয়াযিদ নামটি আরবের মাঝে একটি প্রসিদ্ধ নাম। তাদের মধ্যে ইয়াযিদ ইবন মু‘আবিয়া’র চাচা ইয়াযিদ ইবন আবি সুফিয়ান ছিলেন বিজয়ী সেনাপতি, সম্মানিত সাহাবী।

কেন আমরা তাদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি করব?

আমাদের ও শী‘আদের মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টার বিনিময়স্বরূপ যদি এখন আমাদেরকে তাদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কচ্যুতি করতে হয়; তবে তাদের প্রথম ইমাম আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র জন্য তাঁর সন্তানদের নাম আবূ বকর, ওমর ও ওসমান রাখাটা ভুল হত; তার জন্য আরও বড় ভুল হত তাঁর কন্যাকে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র নিকট বিয়ে দেওয়াটা; আর মুহাম্মদ ইবন হানফীয়া কর্তৃক ইয়াযিদের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদানে মিথ্যাবাদী হতেন। যখন ইবন যুবায়েরের প্রচারক আবদুল্লাহ ইবন মুতি‘ তার নিকট আগমন করল এবং তাকে বলল যে, ইয়াযিদ মদ পান করে, নামায তরক করে এবং কিতাবের বিধান লঙ্ঘন করে; তখন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবি তালিব তাকে বললেন, (যার বর্ণনা ‘বেদায়া ওয়ান নেহায়া’ (البداية و النهاية) গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় এসেছে:) “তোমরা যা বলেছ, আমি তার কাছ থেকে তেমন কিছু দেখিনি; আমি তার নিকট হাযির হয়েছি এবং তার নিকট অবস্থান করেছি; অতঃপর আমি তাকে দেখেছি নামাযে নিয়মিত, কল্যাণকর

বিষয়ে চিন্তাশীল, ইলমে ফিকহ সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন এবং সুন্নাতের অনুসারী।”

ইবন মুতি‘ ও তার সঙ্গী-সাথীরা বলল: সে এসব কিছু তোমাকে দেখানোর জন্য করেছে।

তিনি বললেন: “আমার থেকে সে কী এমন ভয় বা আশা করল যে, আমাকে দেখানোর জন্য সে খুশু বা বিনয় প্রকাশ করবে? মদ পান করার ব্যাপারে তোমরা যা বর্ণনা করেছ, সে ব্যাপারে সে কি তোমাদেরকে জানিয়েছে? সে যদি তোমাদেরকে এই বিষয়ে জানিয়ে থাকে, তবে তোমরাও তার সহযোগী! আর সে যদি তোমাদেরকে না জানিয়ে থাকে, তবে তোমরা যে বিষয়ে জান না, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়।”

তারা বলল, আমরা তাকে না দেখলেও এ বিষয়টি সত্য।

তিনি তাদেরকে বললেন: সাক্ষ্যদাতাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা তা নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦﴾ [سورة الزخرف: ٨٦]

“তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয়, তারা ব্যতীত।”— (সূরা আল-যুখরুফ: ৮৬); আর আমি তোমদের কোন কিছুর ব্যাপারেই ওয়াকিফহাল নই”... শেষ পর্যন্ত।

সুতরাং মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন আবি তালিব ইয়াযীদের ব্যাপারে যে সাক্ষ্য দিলেন, তার অবস্থা যখন এই, তখন শী‘আরা আমাদের নিকট তার (ইয়াযীদের) পিতার[37] সাথে পিতার সাথে আমাদের যে সম্পর্ক চাচ্ছে তার বাস্তবতা কোথায়? অনুরূপভাবে শী‘আদের সাথে ঐক্যের দাবী অনুসারে ঐসব ব্যক্তিবর্গের সাথে আমাদের কী অবস্থা হবে, যারা তার (ইয়াযীদের) পিতা ও আল্লাহর সকল সৃষ্টির চেয়ে উত্তম? অর্থাৎ আবূ বকর, ওমর, ওসমান, তালহা, যুবায়ের, আমর ইবনুল ‘আস এবং সকল বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ যারা আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকে হেফাযত বা সংরক্ষণ করেছেন এবং আমাদের জন্য এই ইসলামী বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে আমরা বসবাস করছি (আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।

---

[37] অর্থাৎ সাইয়্যেদুনা মু‘আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু।

শী‘আরা তাদের পক্ষ থেকে ঐক্য বা তথা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট যে বিনিময় চায়, তা খুবই চড়া; তাতে আমরা সবকিছু হারাব এবং তার বিনিময়স্বরূপ আমরা কিছুই গ্রহণ করতে পারব না। আর আহাম্মক তো সেই ব্যক্তি, যে এমন ব্যক্তির সাথে লেনদেন করে, যে তাকে ঠকাতে চায় জেনেও তার সাথে লেন-দেনে সম্মত হয়।

যে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কচ্যুতির উপর শী‘আ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত, যা নাসির আত-তুসী নির্ধারণ করেছে এবং যার সমর্থন করেছে নিয়ামত উল্যাহ আল-মূসাওয়ী ও আল-খুওয়ানসারী; তার আসল মানে হল ইসলাম ধর্মকে পরিবর্তন করা এবং যাঁদের কাঁধের উপর ভর করে ইসলামের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের সাথে শত্রুতা করা।

তারা এই ক্ষেত্রে মিথ্যা দাবি করে যে, তাদের দলই একমাত্র দল, যারা সার্বিক দিক বিবেচনায় সকলের চেয়ে ব্যতিক্রম।

তাদের থেকেই ইসমাঈলীয়া শী‘আদের উদ্ভব

কারণ ইসমাঈলীয়ারা[38]ও তো তাদের মতই; তারাও শী‘আ ইমামীয়াদের মত করে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করে। [সুতরাং সম্পূর্ণ ভিন্নমত থাকার কারণে কেউ সঠিক পথে আছে সেটা বলার অবকাশ কোথায়?] যদিও শী‘আ ইসমাঈলীয়া ও শী‘আ ইমামীয়াদের মধ্যে আলে বাইতের (নবী পরিবারের) মধ্য থেকে কাদের আনুগত্য করা হবে, সে বিষয়ে কিছুটা মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইমামীয়া শী‘আরা জাফর সাদিক পর্যন্ত প্রত্যেককেই মান্য করে; যাদেরকে ইসমাঈলীয়ারাও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তারা জাফর সাদিকের পরবর্তীদের নিয়ে মতবিরোধ করে। তন্মধ্যে ইমামীয়ারা মূসা ইবন জাফর ও তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীদেরকে ইমাম হিসেবে মান্য। পক্ষান্তরে ইসমাঈলীয়ারা ইসমাঈল ইবন জাফর ও তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীদেরকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে। আর

---

[38] ইসামাঈলীরা বর্তমানে দু’ভাগে বিভক্ত; সুলাইমানিয়া ও দাউদিয়া; তাদের আরেক নাম হচ্ছে, আগাখানিয়া। তারা তাদের আকীদা বিশ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। বাংলাদেশে কোথাও কোথাও তাদেরকে তাহেরীয়া নামেও ডাকা হয়। [সম্পাদক]

ইসমাঈলীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসমাঈল ও তার পরবর্তী ইমামদের নিয়ে যে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনে লিপ্ত হয়েছে, তা দেখে হিংসায় সাফাওয়ী রাজবংশের লোকেরাও তাদের ইমামদের নিয়ে বাড়াবাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে তারা আল-মাজলিসী, তার সহযোগী ও অন্যায় বাড়াবাড়ি শোভিতকারী দলের হাতে শী'আ ইমামীয়ারাও পতনের অতল গহবরে নিমজ্জিত হয়। যদিও ইমামীয়াদের মধ্যে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িকারীর সংখ্যা এর পূর্ব যুগে কম ছিল। কিন্তু তৎপরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত তারা সবাই বাড়াবাড়িকারী ও অতিরঞ্জনকারীতেই পরিণত হল। রাবী বা বর্ণনাকারীদের বিশুদ্ধতা যাছাইয়ের বিষয়ে পারদর্শী তাদের অভিজ্ঞ বড় আলেম আয়াতুল্লাহ আল-মামেকানী তার গ্রন্থে পূর্ববর্তী যুগের অতিরঞ্জনকারী প্রতিটি লোকের জীবনী রচনার সময় এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার সেই বিরাট কিতাবের ঐসব স্থানে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন, যে স্থানে এই আলোচনাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "যে কারণে পূর্ববর্তী লোকেরা অতিরঞ্জনকারী হিসেবে স্বীকৃত হলো, সেগুলো বর্তমান ইমামীয়া' শী'আদের নিকট তাদের মতাদর্শের অত্যাবশ্যক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হলো।"

সুতরাং যে বাড়াবাড়ির কারণে ইসমাঈলীয়ারা ইমামীয়া শী‘আদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, ঠিক একই কারণে তারা সকলেই আবার সমান হয়ে গেল; তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না, তবে পার্থক্য রইল শুধু এটাতে যে তাদের এক শাখা যাদেরকে ইলাহ বা মা‘বুদ বানিয়েছে অপর শাখা অন্যদেরকে ইলাহ বা মা‘বুদ বানিয়েছে। তাদের এক শাখা যে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে নবীর উপরে স্থান দিয়েছে, অপর শাখা অন্য লোকদেরকে নবীর উপর স্থান দিয়েছে। যার জন্য ইমামীয়া শী‘আরা তাদের মুখপাত্র মুহাম্মদ ইবন হাসান আল-আশতিয়ানী’র ভাষায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব গায়েবী বিষয়ের সংবাদ; যেমন, আসমান ও যমিনের সৃষ্টি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের গুণাগুণের বর্ণনা সম্বলিত গায়েবী বিষয় বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে; তারা সেগুলোকে বিশ্বাস না করার বিষয় খুঁজে বেড়ায়। অথচ তারা তাদের ইমামদের সাথে এমন কিছু সম্পর্কিত করে, বিশেষ করে কথিত ‘দ্বাদশ ইমাম’-এর দিকে এমন কিছু ক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত করে যা তাদেরকে গ্রীক মা‘বুদদের পর্যায়ে উন্নীত করে।

মুসলিম সম্প্রদায়সমূহ ও শী‘আ উপদলসমূহের মধ্যে ঐক্য সাধনের অসাধ্যতার অন্যতম কারণ হচ্ছে <u>মূলনীতির ক্ষেত্রে</u>

তাদের পক্ষ থেকে সকল মুসলিমের বিরোধী হওয়া; যেমন নাসির আত-তুসী তা স্বীকার করেছে এবং তা প্রচার করেছে; আর এই ব্যাপারে তাকে সমর্থন দিয়েছে নিয়ামত উল্লাহ আল-মুসাওয়ী, আল-খুওয়ানসারী ও প্রত্যেক শী'আপন্থী। আর যখন (বিরোধিতার) এই অবস্থা ছিল নাসির আল-তুসী'র যামানায়, তখন আল-মাজলিসী'র যুগ থেকে এখনকার সময় পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তার (বিরোধিতার) অবস্থা আরও কঠিন ও ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে!!

শী'আরা নিজেরাও ঐক্য ও সম্প্রীতি চায় না; তারা তো চায় শুধু তাদের মাযহাবের প্রচার, প্রসার

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামীয়া শী'আরা 'তাকরীব' তথা সমন্বয়ে বিশ্বাসী নয়। এই জন্য তারা আমাদের দেশসমূহে 'তাকরীব'-এর দাওয়াত সম্প্রসারণে সক্রিয়ভাবে তৎপর; আর শী'আ রাষ্ট্রসমূহে তারা কোন উচ্চবাচ্য করতে অথবা এই রাস্তায় কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বরাবরই নারাজ। অথবা আমরা তার কিছুটা প্রভাব তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে লক্ষ্য করছি। আর এ জন্যই 'তাকরীব'-এর দিকে দাওয়াতী তৎপরতা

একতরফাভাবে চলছে; যে দিকে আমরা আলোচনার শুরুতেই ইঙ্গিত দিয়েছি। সুতরাং এই দাওয়াতি তৎপরতা অনেকটা ইলেক্ট্রনিক তারের মত, যার পজেটিভ তারটি নেগেটিভ তারের সাথে, আর নেগেটিভ তারটি পজেটিভ তারের সাথে লাগানো যায় না।

আর এ জন্যই এই পথের সকল কার্যক্রম ও তৎপরতা অনেকটা ছেলে খেলার মত এবং তার কোন উপকারিতা নেই। তবে শী'আগণ যখন আবূ বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'র উপর অভিশাপ দেয়া বন্ধ করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যারা শী'আ নন, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা প্রত্যাহার করবে এবং তারা যখন আলে বাইতের পুণ্যবান ইমামদেরকে পুণ্যবান মানুষের স্তর থেকে গ্রিকদের দেবতার স্তরে উন্নীত করার আকিদা থেকে বেঁচে থাকবে, তখন 'তাকরীব'-বা ঐক্য তৎপরতা ফলপ্রসু হতে পারে। কারণ, এই সবগুলোই ইসলামের উপর বাড়াবাড়ি এবং ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণ, বিশেষ করে আলী ইবন আবি তালিব রা. ও তাঁর সন্তানগণ ইসলামকে যেভাবে পরিচালিত করেছেন

তার উল্টো দিকে পরিচালিত করা। সুতরাং শী‘আগণ যদি ইসলামের উপর তাদের এই বাড়াবাড়ি বন্ধ না করে এবং তাদের (ভ্রান্ত) আকিদা-বিশ্বাস ও ইতিহাসকে পরিত্যাগ না করে, তবে তাদের নীতিমালা মুসলিমদের সকল নীতিমালার বিরোধী হওয়ার কারেণ তারা একঘরে হয়েই বেঁচে থাকবে এবং মুসলিম সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করবে।

এখানে আরও একটা বাস্তবতা রয়েছে, যার দিকে আমরা ইতঃপূর্বে এই আলোচনার মধ্যে একটি অপহরণমূলক ইঙ্গিত দিয়েছি। আর তা হল সাম্যবাদ বা কমিউনিজম যা ইরাকে ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে এবং দলীয় সহযোগিতায় তা ইরানেও ছড়িয়ে পড়েছে। আর ইসলামী বিশ্বে সামগ্রিকভাবে তার যে বিরাট প্রভাব রয়েছে, তা হল এ কমিউনিজম মূলত শী‘আপন্থী লোকদেরই তৈরি করা। ঐ দু’টি অঞ্চলের কমিউনিষ্টরা নিরেট শী‘আপন্থী যুবকদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে! কারণ, তারা শী‘আ সম্প্রদায়কে যাবতীয় বিকৃত মস্তিষ্ক, কল্পনাবিলাসী ও বিবেক বহির্ভূত মিথ্যাচারে বদ্ধমূল হিসেবে পেয়েছে এবং তাদেরকে কাফির হিসেবে চিহ্নিত করেছে! আর তারা তাদের (শী‘আদের) সামনে পেয়েছে সাম্যবাদ প্রচারকারী সংস্থা, বিভিন্ন ভাষায় তার

বহু গ্রন্থও রয়েছে; যেগুলো সাম্যবাদের দিকে আহ্বানের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষার ধারা ও পদ্ধতির উপর লিখিত ও প্রচারিত। ফলে তারা তাদের পাতানো ফাঁদে নিপতিত হল। তারা যদি ইসলামী জীবনবিধানকে তার প্রকৃতিগতভাবে জানতে পারত এবং তাকে শী‘আ পদ্ধতির বাইরে গিয়ে যথযথভাবে শিখতে পারত, তবে তা তাদেরকে এই ধরনের অধঃপতন থেকে রক্ষা করত।

বাবিয়া ফিৎনা

একশত বছরেরও অধিক সময়কাল পূর্বে যখন ইরানে ‘বাব’ (البَاب) নামক ফিতনা[39] প্রতিষ্ঠিত হল এবং আলী মুহাম্মদ আশ-শীরাযী দাবি করল যে, সেই হল প্রতীক্ষিত মেহেদী’র ‘বাব’ বা দরজা; অতঃপর এই দাবিতে তার কার্যক্রমের উন্নতি হলে এক

[39] বাব শব্দের অর্থ দরজা। তারা যেহেতু দ্বাদশ ইমামকে দেখেনি, তাই তাদের শয়তানরা এটা আবিস্কার করেছে যে, দ্বাদশ ইমাম মাটির নীচের কক্ষে লুকায়িত আছে। তার কাছে সরাসরি যাওয়া সম্ভব নয়। তার কাছে যাওয়ার জন্য বাব বা দরজা আছে। তাদের যাবতীয় আর্জি সে বাব বা দরজার মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। তখনই তারা একজনকে ইমামের কাছে যাওয়ার জন্য বাব বা দরজা হিসেবে নির্ধারণ করতে আরম্ভ করে। [সম্পাদক]

পর্যায়ে সে দাবি করে বসে যে, সে নিজেই প্রতীক্ষিত মেহেদী। তখন ইরানি শী'আদের অনেকে তার অনুসারী হয়ে যায়, তাই ঐ সময়কার ইরানি সরকার তাকে সেই দেশ থেকে আযারবাইজানে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল। কারণ, তা ছিল হানাফী মাযহাবের অনুসারী সুন্নীদের আবাসস্থল; আর তারা সুন্নী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে শী'আদের শিকড় থেকে উদ্ভূত এই ধরনের স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন ও অলীক কথার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা রয়েছে। ... তাকে কোন শী'আ রাষ্ট্রে নির্বাসনে পাঠানো হয় নি; কারণ, শী'আ মাযহাবের অনুসারীদের প্রকৃতিই হল এই ধরনের আন্দাজ-অনুমান ও সংশয়কে গ্রহণ করে নেয়া। আর তাদের থেকে ঐ ব্যক্তির অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধিও পেয়েছিল এবং ফিতনার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিগত শতাব্দীতে শী'আদের বিভিন্ন অলীক চিন্তাধারাই ছিল তাদের মতের সাথে মিল থাকা বাবীয়া ও বাহায়ীয়াদের দর্শন সম্প্রসারিত হওয়ার অন্যতম কারণ। অনুরূপভাবে বর্তমানে সচেতন শিক্ষিত শী'আপন্থী কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার অন্যতম কারণ তাদের এই অলীক দর্শনগুলোই। কারণ, তাদের এই আকিদা-বিশ্বাসসমূহ দুর্বল ও নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন, যা কোন বিবেকবান মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। ফলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দেয়, যারা

তাদেরকে অভিবাদন জানিয়ে একেবারে কোলে তুলে নেয়। ফলে অন্যান্য সুন্নী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের চেয়ে ইরাক ও ইরানে শী'আদের মধ্য থেকে কমিউনিজমের অধিক দোসর ও সহযোগী তৈরি হওয়া সম্ভব হয়েছে।

এখানে এতটুকুই পেশ করার স্থান করা গেল; আল্লাহ, তাঁর রাসূল, এবং বিশেষভাবে ও সাধারণভাবে সকল মুসলিমের কল্যাণকামনা ও নসীহত করার যে অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের নিকট থেকে নিয়েছেন তাঁরই বাস্তবায়নরূপে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীন ও মিল্লাতকে এবং আমাদের বৃহৎ ইসলামী অবকাঠামোকে কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বংসকারীদের ধ্বংস করা থেকে ও ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করবেন।